Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেও

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রবিউল ইসলাম

রোলঃ 228010973

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেও

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রবিউল ইসলাম

রোলঃ 228010973

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেও " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: রবিউল ইসলাম, আইডিঃ 228010973 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেও " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মো: রবিউল ইসলাম

আইডিঃ 228010973

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

★★★তাসাউফের স্বরুপ ও তার দাবি* 5

★★★আধ্যাত্মিক বিধানের আলোচনা..................................5

★★★তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি..................................5

★★★ তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি 6

★★★ তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা 7

★★★হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মশুদ্ধি..................................8

★★★নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা 9

★★★তাসাওউফের আসল লক্ষ্য কী?..................................9

★★★আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য 11

★★★তাযকিয়া'র ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য * 12

★★★তিনটি গুণের বর্ণনা..................................12

★★★হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার চারটি উদ্দেশ্যঃ.....13

★★★পরিশুদ্ধির প্রয়োজন কেন?..................................14

★★★তাসাওউফের প্রকৃত স্বরূপ 14

★★★রোগ নির্ণয়..................................15

★★★নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল, আর অন্যদের চিন্তায় মগ্ন।..................................15

★★★ সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি 16

★★★ অসুস্থ ব্যক্তির অন্যের অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? 16

★★★ রোগের চিকিৎসা 17

★★★সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি 17

★★★ হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর বৈশিষ্ট্য..................................18

★★★ দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর নিজের সম্পর্কের মুনাফেকির আশঙ্কা..................................18

★★★ তোমরা নিজেকে নিজে ভুলে যেয়ো না.......... 19

★★★ প্রত্যেককে নিজের আমলের জওয়াব দিতে হবে.......... 19

★★★ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তারবিয়াত করেছেন? 20

★★★ সাহাবায়ে কেরাম খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়েছিলেন।.......... 21

★★★ নিজের উপর জরিপ চালান।.......... 22

★★★ঈমানের মধুরতা লাভ করুন.......... 23

★★★তাসাওউফের সারকথা.......... 24

★★★ আত্মশুদ্ধি জরুরী কেন? 24

★★★নিজের জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসক খুঁজে নিন।.......... 25

★★★ দিল থেকে দুনিয়া বের করে দিন 26

★★★'যুহদে'র হাকীকত 26

★★★ দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গোনাহের মূল।.......... 27

★★★ হযরত আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে হুযূর.......... 27

★★★ আত্মা একজনের ভালোবাসাই ধারণ করতে পারে।.......... 28

★★★দুনিয়াতে আছি, কিন্তু দুনিয়া-অন্বেষী নই.......... 29

★★★ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত.......... 30

★★★দুনিয়ার দৃষ্টান্ত টয়লেটের মতো।.......... 30

★★★দুনিয়ার জীবন যেন ধোঁকায় না ফেলে 31

★★★দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে চলে আসে.......... 32

★★★ দুনিয়া ছায়ার ন্যায়.......... 32

★★★এ দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধ্বংস না করে 33

★★★ সারা পৃথিবী মশার পাখার সমানও নয়.......... 33

★★★ একদিন মরতে হবে 34

★★★ যুহদ কিভাবে লাভ হবে? 35

★★★তাসাওউফের সারকথা দুটি বিষয় 36
★★★নফসকে ফুসলিয়ে কাজ নাও..36
★★★ কুদৃষ্টি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি..37
★★★কুদৃষ্টির স্বরূপ..38
★★★কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার চিকিৎসা 38
★★★ পথচলার সময় দৃষ্টি নত রাখুন..39
★★★ এ কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের চেয়ে কম 40
★★★ সাহসিকতার সাথে কাজ করুন 41
★★★ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চরিত্র অবলম্বন করুন।..41
★★★ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পদ্ধতি অবলম্বন করুন।..42
★★★সমস্ত গোনাহ থেকে বাঁচার একটাই ব্যবস্থা 44
★★★প্রকৃত মুজাহিদ কে? 44
★★★পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?..45
★★★আসল জিনিস গোনাহ থেকে বাঁচা..46
★★★আত্মশুদ্ধিকামীদের জন্য প্রথম কাজ..46
★★★সব ধরনের গোনাহ ত্যাগ করুন!..47
★★★গোনাহ কী জিনিস? 47
★★★গোনাহের দ্বিতীয় খারাবি অন্তরে মরিচা পড়া 48
★★★গোনাহের চিন্তার ক্ষেত্রে মুমিন ও ফাসেকের পার্থক্য..49
★★★নেককাজ ছুটে গেলে ঈমানদারদের অবস্থা..49
★★★গোনাহের তৃতীয় খারাবি অন্ধকার..50
★★★গোনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত 50
★★★গোনাহের চতুর্থ খারাবি বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়া 51
★★★বান্দা তো সেই, যে হুকুম পালন করে..51

★★★গোনাহ ছাড়লে নূর লাভ হয়...51
★★★গোনাহের পঞ্চম ক্ষতি বৃষ্টি বন্ধ হওয়া...52
★★★গোনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি রোগ সৃষ্টি হওয়া...52
★★★গোনাহের সপ্তম ক্ষতি খুন-খারাবি..52
★★★ওযীফার চেয়ে গোনাহ ছাড়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত.........................53
★★★মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত।...53
★★★গোনাহ লিখতে বিলম্ব করা হয়।...54
★★★যেখানে গোনাহ করেছেন, সেখানেই তাওবা করুন।...55
★★★গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিন।...55
★★★আল্লাহর ভয় গোনাহের প্রতিষেধক..55
★★★এর নাম 'তাকওয়া'..56
★★★আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব।..56
★★★সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া...56
★★★গোনাহের চাহিদা হলে এ কথা চিন্তা করুন!...57
★★★গোনাহের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী...57
★★★যৌবনকালে ভয় ও বৃদ্ধকালে আশা...58
★★★আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন...58
★★★নির্জনে আল্লাহর ভয়...59
★★★সর্বত্র আল্লাহর এই ভয় সৃষ্টি করুন...59
★★★জান্নাত কার জন্য?..60
★★★নেক বান্দাগণের অবস্থা...61
★★★মারেফাত অনুপাতে আল্লাহর ভয় হয়ে থাকে।..61
★★★হযরত হানযালা রাযি.-এর ভয়...62
★★★হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর ভয়..62

★★★ভয় সৃষ্টি করার উপায় 64
★★★আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ পদ্ধতি 65
★★★প্রত্যেক সময়ের দু'আ ভিন্ন 65
★★★আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি 66
★★★আল্লাহ তা'আলা যিকিরের মুখাপেক্ষী নন 67
★★★আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফলত সমস্ত গোনাহের মূল। 67
★★★আল্লাহ কোথায় গেছেন! 68
★★★আল্লাহর সাথে সম্পর্কের হাকীকত 70
★★★সব সময় চাইতে থাকুন 70
★★★শয়তান ঈমান চোর 70
★★★গোনাহের চিন্তা 72
★★★মন্দ চিন্তার সময় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। 72
★★★নামাযের মধ্যে উদিত বিভিন্ন চিন্তার বিধান 73
★★★নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না 74
★★★নেক কাজ এবং গোনাহের ইচ্ছার উপর পুরস্কার 74
★★★কার নামাযের মধ্যে রূহানিয়াত বেশি? 75
★★★নিরাশ হবেন না 76
★★★সারকথা 76

★★★তাসাউফের স্বরূপ ও তার দাবি*

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন-

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে

আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। ৬. নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।'^১

* ইসলাহী খুতুবাত খন্ড -১৫, পৃষ্ঠা ১১৮-১৩৪
১. সূরা মু'মিনুন ১-৭

★★★আধ্যাত্মিক বিধানের আলোচনা

পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন, তেমনিভাবে অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধানও আমাদের উপর আরোপ করেছেন। যেমন মানুষের অন্তরে ইখলাস থাকতে হবে, রিয়া থাকা যাবে না। অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত থাকতে হবে। বিনয় থাকতে হবে, অহমিকা থাকা যাবে না। ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। শোকরের ক্ষেত্রে শোকর করতে হবে। এসব বিধানের সম্পর্ক মানুষের অভ্যন্তর ও কলবের সঙ্গে।

★★★তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি

আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত যেসব বিষয় আমি আলোচনা করছি, সেগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলো অর্জন করার পদ্ধতি তাসাওউফশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে মানুষ তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্যের শিকার। কতক মানুষ মনে করে যে, শরীয়তের সাথে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফের কোথাও তাসাওউফের কথা উল্লেখ নেই। তাসাওউফ গ্রহণ করা বিদ'আত। ভালো করে বুঝুন! কুরআনে

কারীম এবং হাদীস শরীফে নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের যেই নির্দেশ এসেছে তাই তাসাওউফের বিষয়বস্তু। এজন্য তাসাওউফ কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের পরিপন্থী কিছু নয়। অপরদিকে কতিপয় লোক তাসাওউফকে ভুল ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছে। তাদের নিকট তাসাওউফের অর্থ মোরাকাবা করা, কাশফ অর্জন হওয়া, ইলহাম হওয়া, স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা জানতে পারা এবং কারামত অর্জন হওয়া ইত্যাদি। তাদের নিকট এগুলোরই নাম তাসাওউফ। এর ফলে তারা কতক সময় তাসাওউফের নামে শরীয়তপরিপন্থী কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এ ব্যাপ্যারে তারা দু'ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে।

★★★ তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি

আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত যেসব বিষয় আমি আলোচনা করছি, সেগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলো অর্জন করার পদ্ধতি তাসাওউফশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে মানুষ তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্যের শিকার। কতক মানুষ মনে করে যে, শরীয়তের সাথে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফের কোথাও তাসাওউফের কথা উল্লেখ নেই। তাসাওউফ গ্রহণ করা বিদ'আত। ভালো করে বুঝুন! কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফে নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের যেই নির্দেশ এসেছে তাই তাসাওউফের বিষয়বস্তু। এজন্য তাসাওউফ কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের পরিপন্থী কিছু নয়। অপরদিকে কতিপয় লোক তাসাওউফকে ভুল ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছে। তাদের নিকট তাসাওউফের অর্থ মোরাকাবা করা, কাশফ অর্জন হওয়া, ইলহাম হওয়া, স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা জানতে পারা এবং কারামত অর্জন হওয়া ইত্যাদি। তাদের নিকট এগুলোরই নাম তাসাওউফ। এর ফলে তারা কতক সময় তাসাওউফের নামে শরীয়তপরিপন্থী কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এ ব্যাপ্যারে তারা দু'ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে।

★★★ তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা

তাসাওউফের প্রকৃত রূপরেখা নীতি-চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ আমলের সংশোধন। এর জন্য সুন্নাতের অনুসারী সঠিক ইলমের ধারক এবং সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিজের অনুসরণীয় বানানো জরুরী। যিনি কোনো মুরুব্বীর মাধ্যমে নিজের তারবিয়াত করিয়েছেন। তার কাছে গিয়ে বলবে যে, আমি আপনার দিকনির্দেশনা চাই। তিনি তাকে দিকনির্দেশনা দান করবেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের মুরুব্বী বানিয়েছিলেন। তাঁর তারবিয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধন করেছিলেন। তাঁর আনুগত্য করেছিলেন। এ রূপরেখা পরিপূর্ণ সঠিক। এ পীর-মুরীদী বিশুদ্ধ এবং কুরআন-হাদীস ভিত্তিক। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় উত্তম চরিত্র গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একহাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِا تَتِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

আমাকে মানুষের আখলাককে পরিশুদ্ধ করা এবং সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।"^১

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন যে, আপনি যেভাবে বলবেন আমরা সেভাবে আমল করবো। আমাদের মন চাক বা না চাক, আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে ধরুক বা না ধরুক, আপনি যা কিছু বলবেন সে অনুপাতে আমরা আমল করবো। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর আখলাককে এমন পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল করেন যে, তাঁদের পরে পৃথিবীর বুকে এবং আসমানের নিচে এমন উত্তম চরিত্রের লোক আর সৃষ্টি হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কখনোই নিজেদের নফসের ব্যাপারে গাফেল হতেন না। তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সোহবত তাঁদেরকে নিখাদ বানিয়েছিলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সবসময় এই আশঙ্কা করতেন যে, আমরা সঠিক পথ থেকে আবার বিচ্যুত হয়ে না যাই।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান

হযরত ওমর ফারুক রাযি. যাঁর সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ

'আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে ওমর নবী হতো।"^২

যিনি নিজ কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ওমর জান্নাতে যাবে। যিনি সরাসরি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, হে ওমর! আমি যখন মেরাজে যাই এবং জান্নাতে ভ্রমণ করি তখন জান্নাতে একটি জমকালো মহল দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করি এ মহলটি কার? আমাকে বলা হয় যে, এটা ওমর ইবনে খাত্তাবের মহল। আমার মন চাইলো মহলের ভিতরে প্রবেশ করে দেখি। কিন্তু তোমার আত্নমর্যাদাবোধের কথা স্বরন হওয়ায় তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তোমার ঘরে প্রবেশ করিনি। হযরত ওমর রাযি. এ কথা শুনে কেদে ফেললেন এবং বললেন,

" হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আত্নমর্যাদাবোধ দেখাবো? ^৩

১. সুনানে বাইহাকী,খন্ড -২,পৃষ্ঠা -৪৭২,হাদীস নং ২১৩০১

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৯

৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩

★★★হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মশুদ্ধি

হযরত আবু হুরায়রা রাযি, একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। শিক্ষিত সাহাবী ছিলেন। সূফী মনের বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একবার তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর বানানো হয়। দিনে তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, আর সন্ধ্যায় মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে লাকড়ি বিক্রি করতেন।

এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কাজ কেন করছেন?

তিনি বললেন, আমার নফস খুবই দুষ্ট। আমার ভয় হয় শাসক হওয়ার ফলে আমার অন্তরে আবার অহংকার চলে না আসে। এজন্য আমি আমার নফসকে নিজের বাস্তব অবস্থা বারবার দেখাই যে, তোমার বাস্তবতা এই।

★★★নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা

যাই হোক, কুরাআনে কারীমের এই হুকুম মতে সঠিক ইলমের অধিকারী, বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী, বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের অনুসারী এবং কোনো বুযুর্গের কাছে নিজেকে সংশোধনকারী আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া এবং তার দিকনির্দেশনা মোতাবেক আমল করা নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা।

★★★তাসাওউফের আসল লক্ষ্য কী?

তাসাওউফ, তরীকত, সুলুক, ইহসান একই অর্থের বিভিন্ন শব্দ। তাসাওউফের উদ্দেশ্য কেবল যিকির করা নয়। অনেকে মনে করে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য কেবলই যিকির করা। আমরা যখন কোনো শাইখের কাছে বাইআত হবো, তখন তিনি আমাদেরকে ওযীফা বলে দিবেন। কেউ কেউ মনে করে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য তাবিয-কবজ ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। শাইখ আমাদেরকে কিছু আমল, তাবিজ ও রূহানী চিকিৎসা দিবেন। ভালো করে বুঝুন যে, এসবের সঙ্গে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি যিকিরও তাসাওউফের মূল লক্ষ্য নয়। বরং যিকির হলো মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। এমনিভাবে কতক মানুষ মনে করে যে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য হলো, নির্জনে বসে মোরাকাবা করা, চিল্লা লাগানো এবং মুজাহাদা করা, অথচ এগুলো তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং এগুলো হলো মূল উদ্দেশ্য অর্জনের বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি

তাহলে তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا .

'সে ব্যক্তি সফলতা লাভ করলো, যে 'তাযকিয়া' তথা আত্মশুদ্ধি করলো।"^১

আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে তাযকিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের থেকেই হবেন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম দিবেন এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন।"^২

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কিতাব ও হিকমতের তা'লীমকে নবীরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 'তাযকিয়া'কে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। 'তাযকিয়া'র শাব্দিক অর্থ পাক-পবিত্র করা। শরীয়তের পরিভাষায় 'তাযকিয়া'র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের যেমন কিছু বাহ্যিক আমল আছে এবং এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ আছে; যেমন নামায পড়ো, রোযা রাখো, যাকাত দাও, হজ্ব করো ইত্যাদি, এগুলো হলো আদেশ। মিথ্যা বলো না, গীবত করো না, মদ পান করো না, চুরি করো না, ডাকাতি করো না, ইত্যাদি এগুলো হলো নিষেধ এবং গোনাহের কাজ। এগুলো থেকে বাঁচার জন্য শরীয়ত হুকুম দিয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তর অর্থাৎ কলবেরও কিছু কাঙ্খিত গুণ আছে, যেগুলো অর্জন করা ওয়াজিব। এগুলো আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অর্জন করা ছাড়া দায়িত্ব আদায় হবে না। আর কিছু গুণ আছে বর্জণীয়। এগুলো বর্জন করা ওয়াজিব। এগুলো নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শোকর করা ওয়াজিব। কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে সবর করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালার উপরে তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করা ওয়াজিব। তাওয়াযু অর্থাৎ, নিজেকে নিজে ছোট মনে করা এবং বিনয় অবলম্বন করা ওয়াজিব। ইখলাস অর্জন করা ওয়াজিব।
অর্থাৎ, প্রত্যেকটি কাজ কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে। ইখলাস ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। শোকর, সবর, তাওয়াক্কুল, তাওয়াযু, ইখলাস ইত্যাদি গুণসমূহকে 'ফাযায়েল' ও 'আখলাকে ফাযেলা' বলা হয়। এগুলো অর্জন করা ওয়াজিব।

এমনিভাবে আত্মার কিছু খারাপ গুণ আছে, যেগুলো হারাম ও নাজায়েয। যেগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। এগুলোকে 'রাযায়েল' ও 'আখলাকে রাযীলা' বলা হয়। এসব গুণ খারাপ ও দোষণীয়। এগুলোকে নিষ্পেষিত করতে হয়। যাতে এগুলো মানুষকে গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে। উদাহরণস্বরূপ, অহংকার করা, অর্থাৎ নিজেকে নিজে বড়ো মনে করা। হিংসা করা। রিয়া করা, অর্থাৎ, আল্লাহকে খুশি করার পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার জন্যে এবং তাদেরকে দেখানোর জন্যে কোনো দ্বীনি কাজ করা। অহংকার হারাম, হিংসা হারাম, বিদ্বেষ হারাম, প্রদর্শনপ্রবৃত্তি হারাম। অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকা, বরং ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, এটা হারাম। এগুলো রাযায়েল, যা মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। এমনিভাবে ক্রোধকে মানুষ যদি অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তাহলে এটাও রাযায়েলের অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা এই যে, আত্মার অনেক ভালো গুণ আছে, যেগুলো অর্জন করা জরুরী। আর অনেক মন্দ চরিত্র আছে, যেগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরী। সূফীয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ নিজেদের মুরীদ ও শাগরিদদের অন্তরে ভালো গুণ অর্জনের জন্য পানি সিঞ্চন করেন এবং মন্দচরিত্রসমূহকে নিষ্পেষিত করার তালীম দান করেন। যেন মন্দ চরিত্র নিষ্পেষিত করতে করতে তা না থাকার পর্যায়ে চলে যায়। যার জন্য হযরত থানভী রহ. এই পরিভাষা বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমালা বা দরজায়ে ইযালা'। অর্থাৎ, অন্তরে যেসব মন্দ চরিত্র রয়েছে, সেগুলোকে এ পরিমাণ দমন ও নিষ্পেষিত করা যে, ঐ মন্দ চরিত্র থাকবে ঠিকই, তবে তা না থাকার মতো হয়ে যাবে। যাই হোক, তাসাওউফের মধ্যে রাযায়েলকে দমন করতে হয়, আর ফাযায়েলকে অর্জন করতে হয়। এরই নাম 'তাযকিয়া'। এটাই তাসাওউফের মূল লক্ষ্য।

১. সূরা আশ শামস, আয়াত-৯
২. সূরা বাকারাহ, আয়াত -১২৯

★★★আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য

যাই হোক, পীর ও শাইখের হাতে বাই'আত হওয়া ফরয নয়। কোনো শাইখের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধির জন্যে যখন কোনো মানুষ কোনো শাইখের শরণাপন্ন
হয়, তখন তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে উত্তম গুণাবলি লাভ করা এবং মন্দ চরিত্র দূর করা। মন্দ চরিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সুলুক ও তাসাওউফের এটাই মূল উদ্দেশ্য। তবে বিভিন্ন যিকির, আমল ও ওযীফা এ পথের পথিকের জন্য সহযোগী ও উপকারী বিষয়। তবে এসবের পরিমাণ, সময় ও ক্ষণ নির্ধারণ শাইখের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে হওয়া জরুরী। এর মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধির উপকার পাওয়া যায়। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় এসব যিকির ও ওযীফা এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। আসল কাজ হলো নিজের চরিত্রের সংশোধন ও তার পরিশুদ্ধি। এর জন্যে শাইখকে নিজের অবস্থা জানাতে থাকা, তার থেকে দিকনির্দেশনা নিতে থাকা এবং সে অনুপাতে আমল করা অপরিহার্য। সারাটা জীবন এ কাজই করতে থাকবে। শাইখের শরণাপন্ন হওয়ার মূল উদ্দেশ্য এটাই।

এই 'আনফাসে ঈসা' কিতাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. 'রাযায়েল' ও 'ফাযায়েল' সংক্রান্ত যেসব মালফুয ও বাণী সংকলন করেছেন, সেগুলো পড়ছি এবং সাথে সেগুলোর কিছু ব্যাখ্যাও পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় এগুলো বোঝার তাওফীক দান করুন এবং এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দান করুন।

★★★তাযকিয়া'র ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য *

আল্লাহ তায়া’লা কুরআনে এরশাদ করেছেন -

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত তাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী।'^১

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! বেশ কিছুদিন ধরে সূরা মু'মিনুনের প্রথম আয়াতগুচ্ছের তাফসীর ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বর্ণনা চলে আসছে। এসব আয়াত এজন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সেসব মৌলিক গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, একজন মুসলমানের নিকট যেগুলো আল্লাহ তা'আলার কাম্য। আল্লাহ তা'আলা চান আমার ঈমানদার বান্দাগণ এসব গুণের অধিকারী হোক। তারা নিজেদের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টি করুক। আল্লাহ তা'আলা একথাও বলেছেন যে, যারা এসব গুণের ধারক হবে এবং যারা এসব কাজ সম্পাদন করবে তারা সফলকাম হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব গুণের ধারক বানান এবং এসব কাজের তাওফীক দান করুন।

১.সূরা মু'মিনুন ১-৪

★★★তিনটি গুণের বর্ণনা

সর্বপ্রথম গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা নামাযের মধ্যে খুশু অবলম্বন করে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সম্পর্কে প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা অসার, অহেতুক ও অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় না। অর্থাৎ, অহেতুক কাজের মধ্যে নিজের সময় ব্যয় করাকে পছন্দ করে না। অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ

আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি নিবেদন করেছি যে, এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এই যে, তারা যাকাত দেয়। যাকাতও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয। দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। এ সম্পর্কে গত দুই-তিন জুমায় বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছি। এতদসংক্রান্ত জরুরী মাসআলাসমূহও বর্ণনা করেছি। আজ এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ পেশ করবো।

★★★হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার চারটি উদ্দেশ্যঃ

তবে এ কথা বোঝার পূর্বে জেনে নিন যে, কুরআনে কারীম কমপক্ষে চার জায়গায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের দায়িত্বের বর্ণনা দিয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন? কি দায়িত্ব তাকে ন্যস্ত করা হয়েছে? কি কাজ তাকে সম্পাদন করতে হবে? কুরআনে কারীম চার জায়গায় এসব কাজের বর্ণনা দিয়েছে। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

এ আয়াতে সর্বপ্রথম কাজ বলেছেন,

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ

অর্থাৎ, আমি তাঁকে এজন্য পাঠিয়েছি, যেন তিনি মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

দ্বিতীয় কাজ বলেছেন,

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ

আমি তাঁকে এজন্য পাঠিয়েছি, যেন তিনি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ শিক্ষা দেন। কারণ, মানুষ আমার এই কিতাব নিজে নিজে বুঝতে সক্ষম হবে না।

তৃতীয় কাজ বলেছেন,

وَالْحِكْمَةَ

যেন তিনি মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় শিক্ষা দেন।

চতুর্থ কাজ বলেছেন,

وَيُزَكِّيهِمْ

আমি তাঁকে এজন্য পাঠিয়েছি, যেন তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন। তাদেরকে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেন।

★★★পরিশুদ্ধির প্রয়োজন কেন?

আপনারা চিন্তা করে দেখুন এ আয়াতে 'তাযকিয়া' তথা পরিশুদ্ধির বর্ণনার পূর্বে কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের কথা এসেছে। তারপর কুরআনে কারীমের শিক্ষা ও তা'লীমের আলোচনা এসেছে। তারপর হিকমত শিক্ষা দেওয়ার কথা এসেছে। কিন্তু কুরআনে কারীম বলে যে, শুধু এই তিন কাজ যথেষ্ট নয়। বরং আপনার চতুর্থ কাজ এই যে, মানুষের আমল ও আখলাককে পরিশুদ্ধ করবেন। এখন প্রশ্ন জাগে যে, তিনি যখন কুরআনে কারীম শিখিয়েছেন, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, হিকমতের কথার বর্ণনা দিয়েছেন, তাহলে এই অতিরিক্ত কাজের কথা কেন বলা হলো যে, আপনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করবেন।

★★★তাসাওউফের প্রকৃত স্বরূপ

আপনারা তাসাওউফ শব্দটি অনেকবার শুনে থাকবেন। মানুষ তাসাওউফ সম্পর্কে অনেক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে একে একটি অপবিত্র জিনিস বানিয়ে দিয়েছে। অথচ তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য হলো আপনার আবেগ-অনুভূতি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। আপনার স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। আপনার কামনা-বাসনা বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। এগুলোকে বিশুদ্ধ করার পদ্ধতিই তাসাওউফের মধ্যে বলা হয়। এতোটুকুই হলো তাসাওউফের হাকীকত। এর অতিরিক্ত মানুষ যেসব বিষয়কে তাসাওউফের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাসাওউফের সাথে সেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। ফকীহগণ যেভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, বেচা-কেনা, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বাহ্যিক আমলসমূহের বিধান বর্ণনা করে থাকেন, তেমনিভাবে সূফীয়ায়ে কেরাম আত্মার মধ্যে সৃষ্ট আবেগ-অনুভূতির বিধানসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

★★★রোগ নির্ণয়

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তরও দান করেছেন এবং আমাদের একটি রোগও নির্ণয় করেছেন। এটি এমন একটি আয়াত, যা বেশিরভাগ সময় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এর অর্থও আমাদের জানা থাকে না এবং এর মর্মও আমাদের সামনে থাকে না।

ى أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা নিজেদের খবর নাও, তোমরা যদি সঠিক পথে চলে আসো (তোমরা যদি হেদায়েত লাভ করে সঠিক পথ অবলম্বন করো) তাহলে যেসব লোক পথভ্রষ্ট রয়েছে তাদের এই ভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে আল্লাহ তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে কি করেছো?"^১

১. সূরা মায়েদা, আয়াত -১০৫

★★★নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল, আর অন্যদের চিন্তায় মগ্ন।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আমাদের অত্যন্ত মৌলিক একটি ব্যাধির কথা বলেছেন যে, সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার একটি বড়ো কারণ হলো, যে ব্যক্তিই সংস্কারের পতাকা নিয়ে দাঁড়ায়, তারই কামনা থাকে অন্য ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন ও সংস্কার করতে আরম্ভ করুক। আর যে ব্যক্তি অন্যদেরকে আহ্বান করছে, দাওয়াত দিচ্ছে, ইসলাহের পয়গাম দিচ্ছে, সে নিজের ব্যাপারে উদাসীন এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে গাফেল। আমরা সবাই একটু চিন্তা করে দেখি, বিভিন্ন সমাবেশে, বিভিন্ন সভায় আমরা খুব মজা নিয়ে সমাজের মন্দ দিকসমূহের আলোচনা করি আর বলি যে, 'সব মানুষ এই কাজ করছে' 'মানুষের অবস্থা এই', 'সমাজের অবস্থা এতো খারাপ হয়ে গেছে', 'আমি অমুককে দেখেছি সে এই কাজ করছিলো'। এই বিকৃত সমাজে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো অন্যের উপর আপত্তি করা, অন্যের সমালোচনা করা, অন্যের দোষ বর্ণনা করা যে, মানুষ এই করছে, সমাজের মধ্যে এই হচ্ছে ইত্যাদি। আমাদের খুব কম বৈঠকই এবং খুব কম সমাবেশই এসবের আলোচনা থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু কখনো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখার তাওফীক হয় না যে, আমি নিজে কতো নষ্ট হয়ে গেছি। আমার নিজের অবস্থা কতো খারাপ হয়ে গেছে। আমার নিজের কর্মপদ্ধতি কতো ভুল। এর কি পরিমাণ

সংশোধন প্রয়োজন! শুধু অন্যের সমালোচনার ধারা অব্যাহত থাকে। অন্যের দোষের অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর ফল এই হয় যে, সমস্ত আলোচনা কথার ফুলঝুড়ি ফুটানো, আসর জমানো এবং স্বাদ গ্রহণের জন্য হয়ে থাকে। ফলে সংশোধনের দিকে কোনো পদক্ষেপ অগ্রসর হয় না।

★★★ সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি

একটি হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কি অপূর্ব তার এ বাণী! আমাদের সকলের তা মুখস্থ রাখা উচিত। তিনি বলেন,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যে ব্যক্তি বলে যে, সারা দুনিয়ার মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে (অর্থাৎ অন্যদের উপর আপত্তি করে যে, মানুষ বিগড়ে গেছে, তাদের মধ্যে বদদ্বীনী ছেয়ে গেছে, তাদের মধ্যে বিপথগামিতা চলে এসেছে, তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হচ্ছে) সে ব্যক্তি নিজেই সবচে' বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত।"

কারণ এই যে, সে অন্যদের উপর আপত্তি উত্থাপনের জন্য বলছে যে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বাস্তবেই যদি তার ধ্বংস নিয়ে চিন্তা থাকতো, তাহলে আগে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতো এবং নিজের সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতো।

★★★ অসুস্থ ব্যক্তির অন্যের অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়?

যে ব্যক্তির পেট ব্যথা হচ্ছে, পেট মোচড়াচ্ছে, কোনোভাবেই শান্তি পাচ্ছে না, সে অন্যের হাঁচির বিষয়ে কীভাবে চিন্তা করবে? অন্যের হাঁচি আসছে, সর্দি আসছে তা নিয়ে কিসের পরওয়া করবে। আল্লাহ না করুন, আমার পেটে যদি তীব্র ব্যথা হয়, তাহলে আমার নিজের চিন্তা হবে, নিজের জানের চিন্তা হবে, নিজের ব্যথা দূর করার চিন্তা হবে, নিজের কষ্ট দূর করার চিন্তা হবে, তখন অন্যের ব্যাধি ও অন্যের সাধারণ কষ্টের দিকে মনোযোগ যাবে না। এমনও দেখা গেছে যে, নিজের কষ্ট সাধারণ, আর অন্যের কষ্ট অনেক বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কষ্টের চিন্তা এতো বেশি আচ্ছন্ন করে রাখে যে, অন্যের অধিক কষ্টের দিকে দৃষ্টি যায় না।

★★★ রোগের চিকিৎসা

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মধ্যে বলেন যে, হে ঈমানদারগণ! প্রথমে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করো। তোমরা বলো, অমুক গোমরা হয়ে গেছে, অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে। মনে রেখো! তুমি যদি সঠিক পথে থাকো, তাহলে তার বিপথগামিতা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষের সাথে তার নিজের আমল যাবে। এজন্য নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যাবে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা কী আমল করতে? তোমাদের আমল বেশি ভালো ছিলো, নাকি অন্যদের আমল? জানা তো নেই যার উপর আপত্তি করছেন, যার দোষ তালাশ করছেন, তার কোনো কাজ, তার কোনো আঙ্গিক, আল্লাহ তা'আলার নিকট এতো মাকবুল যে, সে আপনার চেয়ে আগে চলে যাবে। মোটকথা, শুধু আসর জমানোর জন্যে, শুধু কথার মজা ভোগ করার জন্যে আমরা যেসব কথা বলে থাকি, তা সংশোধনের পথ নয়।

★★★সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি

সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে, তাঁদের প্রত্যেকে এই চিন্তায় মগ্ন যে, কীভাবে আমি ঠিক হতে পারি? কীভাবে আমার ব্যাধি দূর করতে পারি? হযরত হানযালা রাযি. একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আসতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে অবস্থান করে এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে অন্তরে কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতো, আত্মা কেমন বিগলিত হতো, কেমন আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদিন তিনি অস্থির চিত্তে চিৎকার করতে করতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং নিবেদন করলেন,

نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।" ^১

হযরত হানযালা রাযি. নিজের সম্পর্কে বলছেন যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে মুনাফিক হলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মজলিসে বসা থাকি, আপনার কথাবার্তা শুনি, অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং অবস্থা সংশোধনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন বাইরে চলে যাই এবং দুনিয়ার কাজে মগ্ন হই, তখন আপনার মজলিসে বসে যে আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো তা লোপ পেয়ে যায়। এটা তো মুনাফিকের কাজ যে, বাইরের অবস্থা থাকবে এক

রকম, আর ভিতরের অবস্থা থাকবে অন্য রকম। এ জন্য আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমি মুনাফিক হয়ে যাইনি তো!
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হানযালা! তুমি মুনাফিক হওনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। সবসময় মনের অবস্থা এক রকম থাকে না। কখনো আবেগ-অনুভূতি বেশি হয়, আর কখনো কম হয়। এর দ্বারা এ কথা মনে করা যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, এটা ঠিক নয়।

হযরত হানযালা রাযি.-এর অন্তরে নিজের সম্পর্কে তো চিন্তা জেগেছে যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, কিন্তু তিনি অন্য কাউকে মুনাফিক বলেননি। আত্মসমালোচনা করে নিজেকে নিজে মুনাফিক চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েছেন। নিজের চিন্তা করেছেন যে, আমার মধ্যে মুনাফিকি নেই তো?

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৩৭

★★★ হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর বৈশিষ্ট্য

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনেক রহস্যের কথা বলেছিলেন। তাঁকেই গোপনে মুনাফিকদের পুরো তালিকা বলেছিলেন যে, মদীনা শরীফের অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। এতো আস্থাপূর্ণভাবে বলেছিলেন যে, মদীনা শরীফে কারো মৃত্যু হলে সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ করতেন যে, এর জানাযার নামাযে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. অংশ নিয়েছেন কি না। যদি হযরত হুযাইফা রাযি. অংশ নিতেন তাহলে এটা আলামত ছিলো যে, এ ব্যক্তি মুমিন। আর যদি তিনি ঐ জানাযায় অংশ না নিতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম অনুমান করতেন যে, হয় তো এ ব্যক্তি মুনাফিক। যদি মুমিন হতো তাহলে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. তার জানাযার নামাযে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতেন।

★★★ দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর নিজের সম্পর্কের মুনাফেকির আশঙ্কা

হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. খলীফা হয়েছেন। দুনিয়ার বেশি অর্ধেকের উপর তাঁর রাজত্ব চলছে। প্রসিদ্ধ আছে যে, সবসময় তিনি মানুষের সংশোধনের জন্যে ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত, এমতাবস্থায় তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে তোষামোদ করে বলছেন যে, হে হুযাইফা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে

বলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মুনাফিকদের যেই তালিকা বলেছেন তার মধ্যে খাত্তাবের পুত্র ওমরের নাম নেই তো? হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর অন্তরে চিন্তা জাগছে যে, এ তালিকায় আমার নাম নেই তো? আমি তো মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নই?'^১
১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্ড -৫,পৃষ্ঠা -১৯

★★★ তোমরা নিজেকে নিজে ভুলে যেয়ো না

এরপর আল্লামা নববী রহ. একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমরা কি (অন্য) মানুষকে নেক কাজের হুকুম দাও আর নিজেদেররে নিজেরা ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাবও তিলাওয়াত করো। তোমাদের কি এতোটুকু জ্ঞানও নেই।"^১

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, তোমরা অন্যদেরকে সৎকর্মের উপদেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাও অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো। অর্থাৎ, তোমরা তাওরাতের আলেম হওয়ার কারণে মানুষ তোমাদের শরণাপন্ন হয়। এ নির্দেশ যদিও ইহুদীদের জন্য ছিলো, কিন্তু মুসলিমদের জন্য তা আরো বেশী উপযুক্ত। যে ব্যক্তি অন্যকে নসীহত করছে তার উচিত আগে নিজের উপরে তা বাস্তবায়ন করা।

এ মাসআলা তো আমি আপনাদেরকে পূর্বে বলেছি যে, তাবলীগের বিষয়ে এ বিধান নেই যে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত সে তাবলীগ করবে না, অন্যদেরকে উপদেশ দিবে না, বরং বিধান এই যে, উপদেশ দিবে কিন্তু উপদেশ দানের পর চিন্তা করবে যে, অন্যদেরকে যখন উপদেশ দিচ্ছি তখন নিজেও এর উপর আমল করি। নিজেকে ভুলে না যাই। এরূপ মনে করবে না যে, এ উপদেশ অন্যের জন্যে। বরং চিন্তা করবে যে, এ উপদেশ আমার জন্যেও। আমাকেও এর উপর আমল করতে হবে।
১. সূরা বাকারাহ, আয়াত -৪৪

★★★ প্রত্যেককে নিজের আমলের জওয়াব দিতে হবে

কুরআনে কারীমের ইরশাদ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ইসলাহের ফিকির করো। তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করো এবং হিদায়াতের পথে চলে আসো তাহলে যারা গোমরাহীর দিকে যাচ্ছে, বিপথগামী হচ্ছে, তাদের বিপথগামিতা, তাদের অন্যায় অপকর্ম

তোমাদের ক্ষতি করবে না। তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বলবেন, যা কিছু তোমরা দুনিয়াতে করতে। এ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর নিকট নিজের আমলের উত্তর দিতে হবে। এমন হবে না যে, মন্দ কর্ম করেছে অন্যে, আর জওয়াবদিহি চাওয়া হচ্ছে আমার কাছে যে, সে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলো কেন? বা আমি কোনো খারাপ কাজ করবো আর অপরের নিকট এর জওয়াব চাওয়া হবে, এমন হবে না। বরং প্রত্যেকের নিকট নিজের
আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এজন্য তোমরা প্রথমে নিজের ফিকির করো যে, তোমাদের আমল কেমন? তোমরা যখন আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবে, তখন নিজের আমল সম্পর্কে কি উত্তর দিবে? এজন্য অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার পূর্বে নিজের খবর নাও। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমল আখলাকের উপর জরিপ চালিয়ে দেখবে যে, সে কি কি ভুল পদ্ধতি ও ভুল কর্মে লিপ্ত। তারপর সে ভুলগুলো দূর করার চেষ্টা করবে। এমন যেন না হয় যে, অন্যের দোষ ও মন্দ কর্ম খুঁজে ফিরছে আর নিজের দোষের ব্যাপারে গাফেল।

এক হাদীস শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যে ব্যক্তি বলে যে, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তাদের আমল খারাপ, আকীদা খারাপ, ইবাদত খারাপ, তাই তারা সকলে ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে সবচে' বেশি ধ্বংসগ্রস্ত ব্যক্তি সে নিজে। যে অন্যদের দোষ বর্ণনা করে ঠিকই, কিন্তু নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল। যদি নিজের আমল ও নিজের সংশোধনের চিন্তা জাগে, অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, আমি আল্লাহর সামনে কি জওয়াব দিবো? তাহলে নিশ্চিতভাবে তখন সে নিজেকে নিজে সবচে' খারাপ মনে করবে। তখন অন্যদেরকে খারাপ চোখে দেখবে না।^১

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫৫

★★★ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তারবিয়াত করেছেন?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন। নবুওয়্যাত লাভের পর তেইশ বছর ইহজগতে অবস্থান করেছেন। এমন এক সময় তিনি তাশরীফ আনেন, যখন পুরো আরব উপদ্বীপ গোমরাহী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। আশার কোনো কিরণ চোখে পড়ছিলো না। হেদায়াতের কোনো আলো বিদ্যমান ছিলো না। এমতাবস্থায় তিনি একা তাশরীফ আনেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে বিপ্লব

ঘটাতে হবে। তেইশ বছর পর যখন তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান, তখন আরব উপদ্বীপ থেকে কুফুর ও শিরক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে জাতি ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো, তেইশ বছর পর সেই জাতি সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক আদর্শ নমুনা রূপে দাঁড়িয়ে যায়।

এ বিপ্লব কীভাবে ঘটেছে?

এই তেইশ বছর সময়ের তেরো বছর অতিবাহিত হয়েছে মক্কায়। এ তেরো বছরে না জিহাদের নির্দেশ ছিলো, না কোনো রাজত্ব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিলো, না কোনো আইন কানুন ছিলো। এ সময় হুকুম ছিলো, কেউ তোমাকে মারলেও তার প্রতিশোধ নিবে না। মার খাবে। কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

'(হে নবী) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্যধারণ আল্লাহর তাওফীকেই হবে।"^১

আঘাত করার অনুমতি নেই। অথচ অন্য ব্যক্তি দশবার মারতে পারছে তিনি তো একবার হলেও মারতে পারতেন। হযরত বেলাল হাবশী রাযি.-কে উত্তপ্ত বালির মধ্যে শোয়ানো হচ্ছে। বুকের উপর ভারী পাথর রাখা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাকে অস্বীকার করো। হযরত বেলাল রাযি.-তাঁর উপর জুলুমের প্রতি-উত্তরে একটা থাপ্পড় তো মারতে পারতেন। কিন্তু তখন হুকুম ছিলো যে, মার খেতে থাকো। তাওবার উঠানোর বা হাত উঠানোর অনুমতি নেই।

১.সূরা নাহল, আয়াত -১২৭

★★★ সাহাবায়ে কেরাম খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়েছিলেন।

এসব কেন করা হয়েছিলো? কারণ, পরীক্ষার এ হাঁপড়ে জ্বালিয়ে তাদেরকে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত করা উদ্দেশ্য ছিলো। মার খাবে, আর ধৈর্য ধরবে। কোন্ মানুষ এমন আছে, যাকে অন্য মানুষ মারবে আর তার রাগ হবে না? কিন্তু হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে, রাগকে দমন করো। যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগকে দমন করবে, তখন নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে আল্লাহর হুকুমের সামনে কতাওবান করার উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। এজন্যে মক্কী জীবনের তেরো বছর এভাবে অতিবাহিত হয় যে, তাতে হুকুম ছিলো, অন্যের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হাত উঠাবে না। বরং ইবাদতের মধ্যে মগ্ন থাকবে। আল্লাহমুখী হবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে। আখেরাতের

কথা চিন্তা করবে। জান্নাত জাহান্নামের কথা চিন্তা করবে। নিজের আমল আখলাকের ইসলাহ করবে। দীর্ঘ তেরো বছর সময়ে সাহাবায়ে কেরামের জামাত যখন ধৈর্য ও পরীক্ষার কঠিন সময় অতিক্রম করে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত হন, তখন মদীনা শরীফের জীবনের সূচনা হয়। তখন তিনি সেখানে এমন রাজত্ব এবং এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন যে, আকাশ-বাতাস এমন ব্যবস্থা না ইতিপূর্বে কখনো দেখেছে, না এরপরে কখনো দেখেছে। কারণ, প্রত্যেকে নিজের ইসলাহের চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজেকে নিজে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত করেছিলেন। এজন্য প্রথম কাজ হলো নিজের ইসলাহের ফিকির করা। নিজের ইসলাহের পর মানুষ যখন অন্যের ইসলাহের জন্য অগ্রসর হবে, তখন ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে। সাহাবায়ে কেরাম যে জায়গাতেই পৌঁছেছেন, আল্লাহ তা'আলা বিজয় ও সফলতা তাঁদের ভাগ্য লিপিতে পরিণত করেছেন। কারণ, তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নিজেদের ইসলাহ করিয়েছিলেন।

আজ ইসলাহের যাবতীয় চেষ্টা সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ মনে হয়। সমাজের উপর তার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব দেখা যায় না। এর কারণ এই যে, আমরা নিজেদের ইসলাহের বিষয়ে গাফেল হয়ে গেছি। আমাদের ভিতরে এ চিন্তা নেই যে, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জওয়াব দিতে হবে। আমার মধ্যে যে সমস্ত খারাবী আছে, সেগুলো সংশোধন করার চিন্তা আমার মধ্যে নেই।

★★★ নিজের উপর জরিপ চালান।

আমার আজকের নিবেদনের সারকথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন জরিপ চালিয়ে দেখবে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করছি। ইসলাম হলো পাঁচ ধরনের আমলের সমন্বয়।

১. আকীদা বিশ্বাস সঠিক হতে হবে।

২. ইবাদত তথা নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি সঠিক হতে হবে।

৩. মুআমালাত তথা বেচা-কেনা হালাল পদ্ধতিতে হতে হবে। আমদানী হালাল হতে হবে। হারাম কোনো আমদানী থাকা যাবে না।

৪. মুআশারাত, তথা পরস্পরে একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম-আহকামের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।

৫. আখলাক তথা মানুষের নীতি-চরিত্র বিশুদ্ধ হতে হবে। মন্দ চরিত্র-যেমন বিদ্বেষ, অহংকার, হিংসা, হঠকারিতা প্রভৃতি না থাকতে হবে। উত্তম চরিত্র- যেমন বিনয়, তাওয়াক্কুল, শোকর ও সবর থাকতে হবে।

এ পাঁচ শাখার উপর মানুষ যখন আমল করবে, তখন তার দ্বীন পরিপূর্ণ হবে। তখন সে মানুষ সঠিক অর্থে মুসলিম হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এ পাঁচ শাখাকে সামনে রেখে নিজের উপর জরিপ চালাবে। যেমন আমার আকীদা-বিশ্বাস ঠিক আছে কি না? আমার জিম্মায় জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয, আমি তার মধ্যে কতগুলো আদায় করি, আর কতগুলো ছেড়ে দেই? আমার আমদানী হালাল না হারাম? বাজারে যখন লেনদেন করি, সে লেনদেন সঠিক হয় কি না? আমার নীতি-চরিত্র ঠিক আছে কি না? অন্যের সঙ্গে আমার আচার-ব্যবহার ঠিক আছে কি না? আমি তো মিথ্যা বলি না? আমি তো গীবত করি না? আমি কারো মনে কষ্ট দেই না তো? কাউকে পেরেশান করি না তো? নিজের মধ্যে এসব বিষয়ে জরিপ চালাবে। যদি কোথাও কোনো খারাবী থাকে, তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করবে। যদি একেবারে ছাড়তে না পারে, তাহলে কম করার চেষ্টা করবে।

যেমন দেখবে যে, আমি দিনে কতো বার মিথ্যা বলি। তারপর দেখবে যে, এর মধ্যে থেকে কতো বার মিথ্যা বলাকে অবিলম্বে ছাড়তে পারি। সেগুলো অবিলম্বে ছেড়ে দিবে। মজলিসে বসলে কতবার গীবত করি? তা কি পরিমাণ ছাড়তে পারি? সে পরিমাণ ছেড়ে দিবে। এভাবে জরিপ চালিয়ে গোনাহ ছাড়া শুরু করবে। নিজের ইসলাহের ফিকির জাগ্রত করবে। ইসলাহের ফিকিরের প্রদীপ একবার যদি আপনার হৃদয়ে আলোকিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ প্রদীপ আপনার জীবনকে আলোকিত করবে। একথা চিন্তা করবেন না যে, একজন ঠিক হলে এর কী প্রভাব পড়বে?

★★★ঈমানের মধুরতা লাভ করুন

এক ব্যক্তির অন্তরে কুদৃষ্টি করার চাহিদা পয়দা হলো- আর এমন কে আছে যার অন্তরে এ চাহিদা সৃষ্টি হয় না?- মনের মধ্যে খুব ছটফট করছে, তাকে দেখবোই। কিন্তু আপনি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নজরের হেফাজত করলেন, কুদৃষ্টি দিলেন না। খুব কষ্ট হলো। আত্মা চৌচির হলো। এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের এমন মধুরতা দান করবেন যে, তার তুলনায় কুদৃষ্টির স্বাদ তুচ্ছ। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা, যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে।'^১

এই ওয়াদা শুধুমাত্র কুদৃষ্টির গোনাহের সাথে নির্ধারিত নয়, বরং যাবতীয় গোনাহ ছাড়ার ব্যাপারেই এই ওয়াদা রয়েছে। যেমন গীবত করতে খুব মজা লাগছে। কিন্তু একবার আপনি মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করে গীবত করতে করতে থেমে গেলেন, আল্লাহর ভয়ে গীবতের শব্দ মুখে আসতে আসতে সংযম অবলম্বন করলেন, তখন দেখবেন কেমন স্বাদ উপভোগ হয়। মানুষ যখন গোনাহের স্বাদের পরিবর্তে এই স্বাদে অভ্যস্ত হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বত এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

১. মুসনাদে আহমাদ,খন্ড-৫,পৃষ্ঠা -২৬৪

★★★তাসাওউফের সারকথা

হযরত হাকীমুল উম্মত (কু.সি.) বড়ো চমৎকার কথা বলেছেন, যা সবার মনে রাখার মতো। তিনি বলেন, যেই সামান্য বিষয় তাসাওউফের সার, তা হলো, আল্লাহর কোনো হুকুম পালনে যখন অলসতা লাগে, যেমন, নামাযের সময় হয়েছে, কিন্তু নামাযে যেতে অলসতা লাগছে, তখন অলসতার মোকাবেলা করে ঐ হুকুমটি পালন করবে। আর যখন কোনো গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে অলসতা লাগে, তখন ঐ অলসতার মোকাবেলা করে ঐ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।'

তারপর হযরত থানভী রহ. বলেন,

'ব্যস! এর দ্বারাই তা'আল্লুক মা'আল্লাহ সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারাই তা'আল্লুক মা'আল্লাহতে উন্নতি ঘটে। যার এই গুণ লাভ হলো, তার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।'

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উপর করাত চালিয়ে এবং হাতুড়ি মেরে যখন তাকে পিষে ফেলবে, তখন তা আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

★★★ আত্মশুদ্ধি জরুরী কেন?

মানুষ মনে করে যে, তাসাওউফ শরীয়ত থেকে ভিন্ন কোনো জিনিস। ভালো করে বুঝুন যে, এটা শরীয়তেরই একটা অংশ। মানুষের বাহ্যিক কাজ-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যতো বিধান রয়েছে তার সমষ্টির নাম শরীয়ত। আর অভ্যন্তরীণ আমল-আখলাক সম্পৃক্ত বিধানসমূহের সমষ্টির নাম তরীকত ও তাসাওউফ। আত্মার গুরুত্ব এ জন্য বেশি যে, এটা ঠিক না হলে বাহ্যিক আমলও বেকার হয়ে যায়। মনে করুন আমলের মধ্যে ইখলাস নেই। ইখলাস অর্থ কি? ইখলাস

অর্থ হলো সব কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তালাশ করা। মানুষ যে কোনো কাজ করবে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য করবে। এটা হলো ইখলাস। ইখলাস একটি অভ্যন্তরীণ আমল। কোনো ব্যক্তি যদি ইখলাস ছাড়া নামায পড়ে, এজন্য নামায পড়ে যে, মানুষ আমাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে করবে, ইবাদতগুজার মনে করবে, তার বাহ্যিক আমল তো ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু ভিতরে ইখলাসের প্রাণ নেই এজন্য তার বাহ্যিক এ আমল বেকার। বরং গুনাহের কারণ হবে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى يُرَابِي فَقَدْ أَشْرَكَ

'যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়লো সে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো। ^১

সে যেন আল্লাহর সঙ্গে মাখলুককে শরীক করলো। আল্লাহর পরিবর্তে মাখলুককে খুশি করতে চায়। এজন্য বাহ্যিক আমলকে ঠিক করার জন্যও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি জরুরী। এটা না হা যাবে। ত্যিক আমলও বেকার হয়ে যাবে।

১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল,হাদীস নং ১৬৫১৭

★★★নিজের জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসক খুঁজে নিন।

আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন যে, মানুষ যেহেতু এসব রোগের চিকিৎসা নিজে করতে পারে না, এজন্য কোনো আধ্যাত্মিক চিকিৎসক খুঁজে নিতে হবে। এই চিকিৎসককে পীর বলুন, শাইখ বলুন বা ওস্তাদ বলুন, কিন্তু আসলে তিনি আধ্যাত্মিক রোগের ডাক্তার। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করা পর্যন্ত মানুষ এসব আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত থাকবে। পরিণতিতে তার আমল খারাপ হতে থাকবে।

সামনে যেই অধ্যায় শুরু হচ্ছে এটা তার সামান্য পরিচয়। আখলাকের যতো শাখা রয়েছে তার একেকটির বর্ণনা সামনে আসবে। ভালো আখলাক অর্জনের জন্য কি করতে হবে এবং মন্দ আখলাক দূর করার জন্য কি করতে হবে- তার বিবরণ আসবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে বিষয়টি বোঝার এবং সে অনুপাতে আমল করার তাওফীক দান করুন।

★★★ দিল থেকে দুনিয়া বের করে দিন

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেছেন,

হে লোক সকল নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য তাই তোমাদেরকে যেন দুনিয়ার এ জীবন ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর বিষয়ে তোমাদেরকে যেন ঐ (শয়তান) ধোঁকায় ফেলতে না পারে যে বড়ো ধোঁকাবাজ।^ ১

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন করা জরুরী। এ ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনোটাই পরিশুদ্ধ হতে পারে না। মূলত দুনিয়ার পরিশুদ্ধি দ্বীনের পরিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। এটা শয়তানের ধোঁকা যে, দ্বীন ছাড়াও দুনিয়া উৎকৃষ্ঠ, প্রশান্তিময়, আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক হতে পারে। দুনিয়ার আসবাব-সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ লাভ হওয়া ভিন্ন জিনিস, আর প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি, আরাম ও আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ হওয়া ভিন্ন জিনিস। দুনিয়ার উপায়-উপকরণ ও আসবাব-সামগ্রী দ্বীন ছাড়াও লাভ হতে পারে, টাকার স্তুপ হতে পারে, বাংলো তৈরী হতে পারে, কারখানা দাঁড়িয়ে যেতে পারে, গাড়ি লাভ হতে পারে, কিন্তু মনের প্রশান্তি দ্বীন ছাড়া লাভ হতে পারে না। এ কারণেই দুনিয়ার প্রকৃত শান্তিও কেবল সেসব আল্লাহর ওলী লাভ করে থাকেন, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ তা'আলার বিধানের অনুগামী করেন। এজন্য নিজের আত্মিক চরিত্র সংশোধন করা ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনোটাই সঠিক হতে পারে না। আত্মিক চরিত্রাবলির মধ্যে থেকে বিগত জুমায় দু'টি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো আল্লাহর ভয় আরেকটি হলো তার রহমতের আশা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এগুলো অর্জন করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

১.সূরা ফাতির, আয়াত -৫

★★★'যুহদে'র হাকীকত

আজকেও অত্যন্ত মৌলিক একটি আখলাকের বর্ণনা হবে, যাকে 'যুহদ' বলা হয়। আপনারা এ শব্দ অনেকবার শুনে থাকবেন যে, অমুক ব্যক্তি বড়ো আবেদ, যাহেদ। যার মধ্যে 'যুহদ' রয়েছে তাকে 'যাহেদ' বলে। 'যুহদ' একটি আত্মিক গুণ। যা প্রত্যেক মুসলমানের অর্জন করা জরুরী। যুহদের অর্থ দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়া, দুনিয়ার মহব্বত থেকে আত্মা মুক্ত হওয়া, দুনিয়ার মধ্যে দিল আটকে না থাকা, দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে এভাবে গেঁথে না দেওয়া যে, সবসময় তারই ধ্যান, তারই চিন্তা, তারই কল্পনা এবং তারই জন্য দৌড় ঝাপ চলছে, এর নাম হলো 'যুহদ'।

★★★ দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গোনাহের মূল।

প্রত্যেক মুসলমানের এই গুণ অর্জন করা এ জন্য জরুরী যে, দুনিয়ার ভালোবাসা যদি আত্মাকে আচ্ছন্ন করে নেয় তাহলে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অন্তরে আসতে পারে না। যখন আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অন্তরে থাকে না তখন মানুষের ভালোবাসা ভুল পথে গমন করে। এ কারণেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

'দুনিয়ার ভালোবাসা সব গোনাহের মূল।"^১

মানুষ যদি সমস্ত অন্যায় অপরাধের স্বরূপ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সব কিছুর মধ্যে দুনিয়ার ভালোবাসা কার্যকর দেখতে পাবে। চোর চুরি করছে কেন? দুনিয়ার ভালোবাসার কারণে। কেউ অপকর্ম করছে, তো কেন করছে? দুনিয়ার স্বাদের ভালোবাসা অন্তরে জমে আছে, তাই করছে। মদ্যপ দুনিয়ার স্বাদের পিছনে পড়ার কারণে মদ পান করছে। যে কোনো গোনাহের বিষয়ে চিন্তা করবেন তার পিছনে দুনিয়ার ভালোবাসা কার্যকর দেখতে পাবেন। দুনিয়ার ভালোবাসা যখন আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখন আল্লাহর মহব্বত কি করে সেখানে প্রবেশ করবে?

১.কানযুল উম্মাল,খন্ড-৩

★★★ হযরত আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা।

আত্মাকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে বানিয়েছেন যে, তার মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা কেবল একজনেরই থাকতে পারে। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক লোকের সঙ্গেই সম্পর্ক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা হবে একজনেরই। একজনের মহব্বত সৃষ্টি হলে অন্যদের মহব্বত ঐ পর্যায়ের আর আসতে পারে না। একারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সম্পর্কে বলেছেন-

لَوْ كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

'আমি যদি দুনিয়াতে কাউকে প্রিয় বানাতাম তাহলে আবু বকর রাযি.-কে প্রিয় বানাতাম।'^১

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর সঙ্গে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরিমাণ সম্পর্ক ছিলো যে, দুনিয়াতে আর কারো সঙ্গেই এমন সম্পর্ক ছিলো না। এমনকি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীর রাযি এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি আয়না রাখা হলো আর সেই আয়নার মধ্যে তার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হলো তখন বলা হবে যে, ইনি হলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আয়নার মধ্যে যেই প্রতিবিম্ব রয়েছে তিনি হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মাকাম এতো উর্ধ্বে ছিলো। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, তাকে আমি আমার প্রিয় বানাচ্ছি। বরং বলেছেন, যদি আমি কাউকে প্রিয় বানাতাম তাহলে তাকে বানাতাম। কিন্তু আমার প্রকৃত প্রিয় তো আল্লাহ তা'আলা। তিনি যখন প্রিয় হয়েছেন তখন অন্য কারো সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসার জন্য অন্তরে জায়গা নেই। হ্যাঁ অন্যের সাথে সম্পর্ক হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে। যেমন স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক, সন্তানের সাথে সম্পর্ক, মায়ের সাথে সম্পর্ক, বাপের সাথে সম্পর্ক, ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক, বোনের সাথে সম্পর্ক, কিন্তু এ সমস্ত সম্পর্ক অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যেই ভালোবাসার রয়েছে, তার অনুগামী হয়ে থাকে।

১.সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৮৪

★★★ আত্মা একজনের ভালোবাসাই ধারণ করতে পারে।

অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা হয় আল্লাহর হবে, না হয় দুনিয়ার হবে। উভয় ভালোবাসা এক সঙ্গে একত্রিত হতে পারে না। এ কারণে মাওলানা রূমী রহ বলেন-

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

این خیال است و محال است و جنوں

অর্থাৎ, দুনিয়ার ভালোবাসাও অন্তরে থাকবে আবার আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসাও অন্তরে থাকবে এ উভয়টা একত্রিত হতে পারে না। এ নিছক কল্পনা, অসম্ভব, পাগলামী। এজন্য অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত যদি ছেয়ে যায় তাহলে আল্লাহর মহব্বত আসবে না। আল্লাহর মহব্বত যখন থাকবে না তখন দ্বীনের সমস্ত কাজ নিষ্প্রাণ ও মূল্যহীন হবে। তা আদায় করতে পেরেশানী, জটিলতা ও কষ্ট মনে হবে। প্রকৃত অর্থে তখন দ্বীনের কাজ সম্পাদিত হতে পারবে না। তখন পদে পদে মানুষ হোঁচট খাবে। এজন্য অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতকে জায়গা না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এরই নাম 'যুহদ'। আর 'যুহদ' অর্জন করা জরুরী।

★★★দুনিয়াতে আছি, কিন্তু দুনিয়া-অন্বেষী নই

তবে ভালোভাবে অনুধাবন করুন যে, বিষয়টি অনেক কঠিন। কারণ, গুনিয়া ছাড়া চলাও সম্ভব নয়। দুনিয়াতে থাকতে হবে। ক্ষুধা লাগলে আহার করতে হবে। পিপাসা লাগলে পানি পান করতে হবে। মাথা গোঁজার জন্যে ঘরের প্রয়োজন রয়েছে। জীবন ধারণের জন্যে জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজন হয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে যে, মানুষের সাথে এতো সব বিষয় জড়িত থাকা সত্ত্বেও, দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করেও এবং দুনিয়ার প্রয়োজনসমূহ পূরা করেও অন্তরে দুনিয়া আসবে না, তা কি করে সম্ভব? এমতাবস্থায় কি করে আত্মা দুনিয়াবিমুখ হবে? এতদুভয় বিষয় একত্রিত হওয়া তো কঠিন মনে হয়। নবীগণ এবং তাদের ওয়ারিশগণ এ বিষয়টি শিক্ষা দিয়ে থাকেন যে, তোমরা দুনিয়াতে থেকেও কীভাবে দুনিয়ার মহব্বতকে অন্তরে জায়গা দিবে না। একজন প্রকৃত মুসলিম দুনিয়ার মধ্যে অবস্থানও করবে, মানুষের সাথে সম্পর্কও রাখবে, তাদের হকও আদায় করবে, একই সাথে দুনিয়ার মহব্বত থেকেও বেঁচে থাকবে। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব রহ. বলেন,

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں

'দুনিয়াতে রয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার অন্বেষী নই, বাজার অতিক্রম করছি, কিন্তু খরিদ্দার নই।'

এ অবস্থা কি করে সৃষ্টি হয় যে, মানুষ দুনিয়ার মধ্যে থাকবে, দুনিয়ার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে, দুনিয়াকে ব্যবহার করবে, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে আসবে না।

★★★ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

এ বিষয়টিই হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। বড়ো চমৎকার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেন, দুনিয়া ছাড়া মানুষ চলতে পারবে না। দুনিয়ায় বসবাস করতে পার্থিব অসংখ্য প্রয়োজন মানুষের রয়েছে। মানুষের দৃষ্টান্ত নৌকার ন্যায়, আর দুনিয়ার দৃষ্টান্ত পানির ন্যায়। পানি ছাড়া নৌকা চলতে পারে না। কেউ যদি স্থলভাগে নৌকা চালাতে চায় নৌকা চলবে না। তেমনিভাবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দুনিয়া প্রয়োজন। বেঁচে থাকতে হলে পয়সা লাগবে, খাদ্য লাগবে, পানি লাগবে, বাড়ি লাগবে, কাপড় লাগবে এসব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। আর এ সব কিছুই দুনিয়া। কিন্তু পানি নৌকার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী যতক্ষণ পর্যন্ত তা নৌকার নীচে, ডানে বামে এবং সামনে পিছনে থাকে। পানি তখন নৌকাকে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই পানিই যদি নৌকার ভিতরে ডুকে পড়ে তাহলে তা নৌকাকে ডুবিয়ে দেয়, ধ্বংস করে।

তেমনিভাবে এ সমস্ত উপকরণ এবং দুনিয়ার এ সমস্ত সাজ সরঞ্জাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চর্তুদিকে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ভয় নেই। এ সমস্ত সামগ্রী তোমাদের জীবনের নৌকাকে পরিচালিত করবে। কিন্তু যেদিন দুনিয়ার এসব সাজ সরঞ্জাম তোমাদের আত্মার নৌকায় প্রবেশ করবে সেদিন তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিবে। মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی بلاک کشتی است

অর্থাৎ, পানি যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকার চর্তুদিকে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নৌকাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু ঐ পানি যদি নৌকার ভিতরে প্রবেশ করে তখন তা নৌকাকে ডুবিয়ে দেয়।

★★★দুনিয়ার দৃষ্টান্ত টয়লেটের মতো।

সাধারণত এ বিষয়টি বুঝে আসে না যে, একদিকে মানুষ এ দুনিয়াকে জরুরীও মনে করবে, তাকে গুরুত্বপূর্ণও মনে করবে, কিন্তু তার ভালোবাসা অন্তরে থাকবে না, তা কি করে সম্ভব! বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝুন।

আপনি যখন কোনো বাড়ি বানান, সেই বাড়ির বিভিন্ন অংশ থাকে। একটি কামরা থাকে ঘুমানোর, একটি থাকে সাক্ষাতের, একটি খানা খাওয়ার ইত্যাদি। সে বাড়িতেই আপনি একটি টয়লেটও বানান। টয়লেট ছাড়া বাড়ি অসম্পূর্ণ। একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি রয়েছে, তার কামরা সুন্দর, বেড রুম খুব উন্নত মানের, ড্রইং রুমও উন্নত মানের, ডাইনিং রুমও উন্নত মানের,

পুরো ঘরে অনেক দামী দামী ফার্নিচার সাজানো রয়েছে, কিন্তু তাতে টয়লেট নেই, বলুন! সে বাড়ি কি পরিপূর্ণ, না অসম্পূর্ণ? বলা বাহুল্য যে, সে বাড়িটি অসম্পূর্ণ। টয়লেট ছাড়া কোনো বাড়ি পরিপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু বলুন, এমন কোনো মানুষ আছে কি, যার আত্মা সব সময় টয়লেটের সাথে সংযুক্ত থাকবে? তার মন-মস্তিষ্কে সব সময় এ চিন্তা বিরাজ করবে যে, কখন আমি টয়লেটে যাবো, কখন তাতে বসবো, কিভাবে বসবো, কতক্ষণ বসবো, কখন বের হয়ে আসবো? বলা বাহুল্য যে, কোনো মানুষই নিজের মন-মস্তিষ্কে টয়লেটকে এভাবে চাপিয়ে দিবে না। কখনই নিজের অন্তরে তাকে জায়গা দিবে না। যদিও সে জানে টয়লেট জরুরী জিনিস। এটা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সব সময় সে এ চিন্তায় থাকবে না যে, আমি টয়লেটকে কি করে সাজাবো, কিভাবে আরামদায়ক বানাবো। কারণ, টয়লেটের ভালোবাসা অন্তরে নেই।

★★★দুনিয়ার জীবন যেন ধোঁকায় না ফেলে

দ্বীনের শিক্ষা মূলত এই যে, এ সমস্ত ধন সম্পদ ও সাজ সরঞ্জামও জরুরী এবং এমনই জরুরী যেমন টয়লেট জরুরী। কিন্তু তার চিন্তা, তার ভালোবাসা ও তার কল্পনা যেন মন মগজকে আচ্ছন্ন করে না রাখে। এটা হলো দুনিয়ার হাকীকত। এজন্য বুযুর্গগণ বলেছেন, দুনিয়ার হাকীকত সব সময় স্মরণ রাখবে। আমি যেই আয়াত আপনাদের সামনে এখন তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'হে লোক সকল! নিশ্চিত বিশ্বাস করো যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তাই দুনিয়ার এ জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর বিষয়ে তোমাদেরকে সেই (শয়তানও) যেন ধোঁকায় না ফেলতে পারে, যে বড় প্রতারক।"

হে লোক সকল! আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর ওয়াদা কি? সেই ওয়াদা হলো একদিন তুমি মরবে। তার সামনে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে। তোমাকে সমস্ত আমলের জওয়াব দিতে হবে। এজন্য দুনিয়ার জীবন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। আর সেই ধোঁকাবাজ অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে। শরীয়তের শিক্ষা হলো দুনিয়াতে অবস্থান করো কিন্তু তার দ্বারা ধোঁকা খেয়ো না। কারণ এটা পরীক্ষার জায়গা। এখানে এমন অনেক দৃশ্য রয়েছে, যা মানুষের আত্মাকে আকৃষ্ট করে। মোহগ্রস্থ করে। তাই মনোহরী এসব দৃশ্যের ভালোবাসাকে অন্তরে জায়গা দিও না। দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা হলেও কোনো সমস্যা নেই, যদি তার সঙ্গে আত্মা যুক্ত না হয়।

★★★দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে চলে আসে

সারাজীবন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের এ নিয়ম দেখেছি যে, যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিসের ব্যাপারে বিনা কারণে তার সাথে ঝগড়া করতো তখনই হযরত ওয়ালেদ ছাহেব হকের উপর থাকা সত্ত্বেও বলতেন, আরে ভাই! ঝগড়া বাদ দাও, এটা নিয়ে যাও। নিজের হক ছেড়ে দিতেন তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শোনাতেন,

وَمَنْ تَرَكَ الْبَرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِهَا

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘর দেওয়ানোর দায়িত্ব নিচ্ছি, যে সত্যের উপর থেকেও ঝগড়া পরিহার করবে।"১

হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে সারাজীবন এ হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। অনেক সময় আমাদের মনে হতো, তিনি হকের উপর আছেন, অটল থাকলে তিনি নিজের হক পেয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি হক ছেড়ে দিয়ে চলে আসতেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াও দান করেন। এমন লোকদের কাছে দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে আসে, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে,

أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একবার এ দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দুনিয়াকে অপমানিত করে দেন। দুনিয়া তার পায়ের উপরে এসে আছড়ে পড়ে। কিন্তু তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে না।'২

১.সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ১৯১৬
২.সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২৩৮৯

★★★ দুনিয়া ছায়ার ন্যায়

জনৈক ব্যক্তি দুনিয়ার বড়ো চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত মানুষের ছায়ার ন্যায়। কেউ যদি নিজের ছায়ার পশ্চাদ গমন করতে চায় এবং তাকে ধরতে চায় তাহলে তার ফল এই হবে যে, সে তার ছায়ার পিছনে যতো দৌড়াবে তার ছায়া আরো সম্মুখে দৌড়াতে থাকবে। কখনই তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু মানুষ যদি তার ছায়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিপরীত দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে তাহলে ছায়া তার পিছনে পিছনে আসবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকেও এমনই বানিয়েছেন। দুনিয়ার অনুসন্ধানী হয়ে এবং তার ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে

তার পিছনে পিছনে যদি দৌড়াও তাহলে এ দুনিয়া তোমার আগে আগে দৌড়াবে। কখনই তুমি তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু যেদিন একবার তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তখন দেখবে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাকে লাঞ্ছিত করে নিয়ে আসেন। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, দুনিয়া এমন ব্যক্তির কাছে আসে আর সে তাকে লাথি মারে। কিন্তু এ দুনিয়া আবারো তার পায়ের উপরে এসে পড়ে। এর জন্যে একবার খাঁটি অন্তরে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আর এটা লাভ হয় দুনিয়ার স্বরূপ বুঝলে। দুনিয়ার স্বরূপ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের হাদীসসমূহে বর্ণনা করেছেন, এসব হাদীস পড়ে দুনিয়ার ভালোবাসা আত্মা থেকে বের করার চিন্তা ও চেষ্টা করা উচিত।

★★★এ দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধ্বংস না করে

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আগামীতে প্রথমত উম্মতের উপর ব্যাপক অভাব অনটন আসবে না। সুতরাং মুসলিমদের পুরো ইতিহাস ঘেটে দেখুন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ব্যাপক অভাব অনটন কখনো আসেনি, বরং স্বচ্ছলতার যুগ এসেছে। তিনি বলেছেন, মুসলিমদের উপর অভাব অনটন আসলেও সে কারণে আমি ক্ষতির আশঙ্কা করি না, বেশির চে' বেশি পার্থিব কষ্ট হবে, কিন্তু সে কারণে গোমরাহী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমাদের উপর এভাবে দুনিয়ার প্রসার ঘটানো হবে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ঘটানো হয়েছে। তোমাদের চর্তুদিকে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-দৌলতের স্তুপ লেগে থাকবে তখন তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে। একে অপরের থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে। চিন্তা করবে অমুকের যেমন বাংলো আছে আমারও যেন তেমন হয়। অমুকের যেমন গাড়ি আছে, আমারও যেন তেমন থাকে। অমুকের যেমন কাপড় আছে, আমারও যেন তেমন হয়। বরং তার চেয়ে আগে বাড়ার কামনা হবে। পরিণতি এই হবে যে, এ দুনিয়া তোমাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করবে, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে।

★★★ সারা পৃথিবী মশার পাখার সমানও নয়

এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً

আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দুনিয়ার মূল্য যদি মশার একটি পাখার। সমানও হতো তাহলে কোনো কাফেরকে দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান
করতে দিতেন না। ১

তোমরা দেখছো যে, দুনিয়ার দৌলত কাফেররা খুব লাভ করছে, তারা খুব ভোগ বিলাসে আছে, অথচ তারা আল্লাহর নাফরমানী করছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে তা সত্ত্বেও তারা দুনিয়া লাভ করছে, এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। মশার একটি পাখার সমানও সারা পৃথিবীর দাম নেই। দুনিয়ার মূল্য যদি মশার একটি ডানার সমানও হতো তাহলে কাফেরদেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।

একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পথ চলছিলেন। পথে তিনি একটি কান কাটা ছাগলের মৃত বাচ্চা পড়ে থাকতে দেখলেন। যা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। তিনি ঐ কান কাটা, মরা বকরীর বাচ্চার দিকে ইশারা করে সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই মরা বাচ্চাটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে? সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ এই বাচ্চা যদি জীবিতও হতো তবুও কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে প্রস্তুত হতো না। আর এখন তো এটা মরা। এই লাশ নিয়ে আমরা কি করবো? এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই পুরো দুনিয়া এবং তার ধন দৌলত আল্লাহ তা'আলার নিকট এরচে' অধিক মূল্যহীন ও নগণ্য, যেই পরিমাণ মূল্যহীন ও নগণ্য তোমাদের নিকট বকরীর এই মরা বাচ্চা।' ২

১.সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২২৪২
২.সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৫২৫৭

★★★ একদিন মরতে হবে

মানুষ একটু চিন্তা করে দেখুক, এ দুনিয়া কয় দিনের! একদিন, দুই দিন, তিন দিন। কার জানা আছে কয়দিন সে দুনিয়ায় থাকবে? তার কি নিশ্চিত জানা আছে, আগামী ঘণ্টা বরং আগামী মুহূর্ত জীবিত থাকবো? বড়ো থেকে বড়ো বিজ্ঞানী, বড়ো থেকে বড়ো দার্শনিক, বড়ো থেকে বড়ো ক্ষমতাধর ব্যক্তি বলতে পারে না যে, কতো দিন সে দুনিয়ায় থাকবে? কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহে লেগে আছে। দিনরাত দুনিয়ার পিছনে দৌড়-ঝাঁপ করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ধান্দায় দৌড়াচ্ছে। কিন্তু যেদিন ডাক আসবে সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে। কিছুই সঙ্গে যাবে না।

দুনিয়া ধোঁকার সামগ্রী

এজন্য কুরআনের আয়াত

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।"১

বলছে যে, দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী। এর পিছনে এমনভাবে মগ্ন হয়ো না যে তা তোমাকে গাফেল করে দেয়। এ দুনিয়াতে জীবন কাটাবে ঠিক, কিন্তু ধোঁকা খাবে না। এ কথা যদি অন্তরে বসে যায় তারপর তোমার কুঠি-বাংলো হোক, মিলকারখানা হোক, দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম হোক, ধন-দৌলত হোক এবং ব্যাংক ব্যালেন্স হোক কোনো সমস্যা নেই। অন্তরে যদি এগুলোর ভালোবাসা না থাকে তাহলে তুমি যাহেদ, তুমি দুনিয়াবিরাগী। আলহামদুলিল্লাহ তখন তোমার যুহদের নেয়ামত লাভ হয়েছে। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে কামালো না তো কিছুই, থাকলো হত-দরিদ্র, কিন্তু অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ভরা। তার যুহদের নেয়ামত লাভ হয়নি। তাকে যাহেদ বলা হবে না। কারণ দুনিয়ার প্রেম ও ভালোবাসায় সে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তি সবচেয়ে ক্ষতির মধ্যে আছে।

১.সূরা হাদীদ, আয়াত ২০

★★★ যুহদ কিভাবে লাভ হবে?

এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই গুণ কিভাবে অর্জন হবে। এটা অর্জন হওয়ার উপায় হলো, কুরআন ও হাদীসের এসব কথা নিয়ে গভীরভাবে মানুষ চিন্তা করবে। মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর বিষয়ে মুরাকাবা করবে। আখেরাতের নেয়ামতসমূহ এবং আখেরাতের আযাবের কথা চিন্তা করবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ধ্যান করবে। এজন্য প্রতিদিন পাঁচ-দশ মিনিট বের করবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা আত্মা থেকে দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দুনিয়ার হাকীকত বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

★★★তাসাওউফের সারকথা দুটি বিষয়

আমাদের হযরত এমন ক্ষেত্রে হযরত থানভী রহ.-এর একটি মালফুয শোনাতেন। মূলত এই মালফযটি স্মরণ রাখার মতো বরং অন্তরে অঙ্কন করে রাখার মতো। হযরত থানভী রহ. বলতেন,

'যেই সামান্য বিষয়টি তাসাওউফের সারকথা তা হলো, যখন কোনো ইবাদত করতে অলসতা লাগবে তখন অলসতার মোকাবিলা করে ঐ ইবাদত করবে। আর যখন কোনো গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে তখন ঐ চাহিদার মোকাবেলা করে সেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। এ বিষয়টি যখন অর্জিত হবে তখন আর অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকবে না। এর দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এর দ্বারাই তা শক্তিশালী হবে এবং এর দ্বারাই তা উন্নত হবে।'

মোটকথা, অলসতা দূর করার রাস্তা একটি অর্থাৎ, সাহস করে তার মোকাবেলা করা। মানুষ মনে করে যে, শাইখ কোনো ব্যবস্থাপত্র দিবেন যা ধুয়ে পান করলে সব অলসতা দূর হয়ে যাবে। সব কাজ ঠিক মতো হতে থাকবে। মনে রাখবেন! সাহস করলেই অলসতার মোকাবেলা হয়। এ ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই।

★★★নফসকে ফুসলিয়ে কাজ নাও

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, নফসকে একটু ফুসলিয়ে তার দ্বারা কাজ আদায় করো। তারপর নিজের একটি ঘটনা শোনান। একদিন তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গলো। খুব অলসতা লাগছিলো। চিন্তা হলো আজ তো শরীরটা ভালো না, অলসতাও লাগছে, জীবন তো পড়ে
আছে তাহাজ্জুদ নামায ওয়াজিব, ফরযও নয় ঘুমিয়ে থাকি। আজকে তাহাজ্জুদ না পড়লে এমন কি হবে?

হযরত বলেন, আমি নিজেকে নিজে বললাম, কথা তো ঠিক, তাহাজ্জুদ নামায ফরয-ওয়াজিব নয়, ওদিকে শরীর ভালো নয়, কিন্তু এটা তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার সময়। হাদীস শরীফে আছে, রাতের এক তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত জগতবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আহবানকারী আহবান করতে থাকে, আছো কোনো ক্ষমাপ্রার্থী তাকে ক্ষমা করা হবে।'

এজন্য এমন বরকতময় সময় বেকার কাটানো ঠিক নয়। তারপর নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললাম, আচ্ছা এক কাজ করো, নামায পড়ো না তবে বিছানার উপরে উঠে বসো, অল্প একটু দু'আ করো। দু'আ করে পুনরায় ঘুমিয়ে যাও। সুতরাং আমি অবিলম্বে উঠে বসে পড়লাম এবং দু'আ করতে আরম্ভ করলাম। দু'আ করতে করতে মনকে আবার বললাম, মিয়া উঠে যখন বসেছো, তো ঘুমতো ভেঙ্গে গেছে। এবার এক কাজ করো, গোসলখানায় যাও, এস্তেঞ্জা সারো তারপর আরামে শুয়ে থাকো। সুতরাং আমি গোসলখানায় চলে যাই এবং এস্তেঞ্জা সারি। তারপর নফসকে বলি, ঠিক আছে ওযুও করি, কারণ ওযু করে দু'আ করলে কবুল হওয়ার অধিক আশা রয়েছে। সুতরাং ওযু করে বিছানায় এসে বসি। দু'আ আরম্ভ করি। তারপর নফসকে বলি, বিছানায় বসে বসে কেমনতর দু'আ হচ্ছে! দু'আ করার তোমার যেই নির্ধারিত জায়গা আছে, জায়নামায আছে, সেখানে গিয়ে দু'আ করো। এ কথা বলে নফসকে জায়নামায পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই। জায়নামাযের উপর পৌছে দ্রুত দু' রাকাত তাহাজ্জুদের নিয়ত করি।

অতপর বলেন, এভাবে নফসকে একটু ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে কাজ করাতে হয়। নফস তোমার সঙ্গে নেক কাজে যেভাবে টালবাহানা করে, তুমিও তার সঙ্গে একই রূপ আচরণ করো। তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাও। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করবেন।

★★★ কুদৃষ্টি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেছেন,
মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"১

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুদৃষ্টি ব্যাধির বর্ণনা দিয়েছেন। কুদৃষ্টি এমন এক ব্যাধি যার মধ্যে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত। শিক্ষিত ও লেখাপড়া জানা মানুষ, আলেম-ওলামা, আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ওঠানো মানুষ, ধার্মিক ও নামায-রোযার পাবন্দ ব্যক্তিরাও এই রোগে আক্রান্ত। আজকাল তো ঘর থেকে বাইরে বের হলে নিজের দৃষ্টিকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। চর্তুদিকে এমন সব দৃশ্য যা থেকে চোখকে বাঁচানো মুশকিল।

১.সূরা নূর,আয়াত ৩০

★★★কুদৃষ্টির স্বরূপ

কুদৃষ্টি হলো, কোনো পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বিশেষ করে কামনার সাথে স্বাদ উপভোগের জন্য দৃষ্টিপাত করা। সেই পরনারী প্রকৃত হোক বা তার ছবি হোক। ছবির উপরও দৃষ্টিপাত করা হারাম। এটাও কুদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

এই কুদৃষ্টি মানুষের আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক। কুদৃষ্টি মানুষের আত্মাকে এমনভাবে ধ্বংস করে যে, তা অন্য সমস্ত গোনাহ থেকে মারাত্মক। মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এর অনেক বেশি দখল রয়েছে। এর সংশোধন না হওয়া এবং দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির চিন্তা করাও প্রায় অসম্ভব। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

النَّظْرُ سَهْمٌ مَّسْمُومٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ

'দৃষ্টি ইবলিসের তীরসমূহের মধ্যে থেকে একটি বিষ মিশ্রিত তীর, এই তীর ইবলিসের ধনুক থেকে বের হয়।"১

কেউ যদি নির্দ্বিধায় তা মেনে নেয় এবং তার সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে তার অর্থ এই যে, তার আত্মশুদ্ধির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হলো। কারণ মানুষের আত্মাকে বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে এই কুদৃষ্টির যেই পরিমাণ দখল রয়েছে সম্ভবত অন্য কোনো গোনাহের এই পরিমাণ দখল নেই।

১.মাজমাউয যাওয়াইদ, খন্ড ৮,পৃষ্ঠা ৬৩

★★★কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার চিকিৎসা

এই কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার একটাই পথ রয়েছে, আর তা হলো, সাহস করে কাজ নিতে হবে, দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, এই দৃষ্টি দ্বারা আমি খারাপ জায়গায় দৃষ্টিপাত করবো না। তারপর আত্মা যদি বিদীর্ণও হয়ে যায় তবুও খারাপ জায়গায়, নিষিদ্ধ জায়গায় দৃষ্টিপাত করো না। কবি বলেন,

آرزو میں خون ہوں، یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

হিম্মত ও সংকল্প করেই দৃষ্টিকে বাঁচাতে হবে তারপর দেখবে আল্লাহ ভা'আলার পক্ষ থেকে কেমন সাহায্য আসে। হযরত থানভী রহ. এই চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু তাদবীর বলেছেন, তা স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেন, 'কোনো মহিলা চোখে পড়লে মন যদি বলে, একবার দেখলে কি সমস্যা? কারণ তুমি তো আর ব্যভিচার করবে না। তখন মনে

রাখতে হবে যে, এটা নফসের ষড়যন্ত্র। বাঁচার উপায় হলো তার কথা মতো
আমল করবে না।১

কারণ এটা শয়তানের ধোঁকা। সে বলে, দেখলে কি সমস্যা? দেখা তো এ জন্য নিষেধ যে, মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর এখানে তো ব্যভিচারের সম্ভাবনা নেই তাই দেখে নাও, কোনো সমস্যা নেই। হযরত বলেন, এটা নফসের চক্রান্ত। এর চিকিৎসা হলো, তার কথা মতো কাজ করবে না। যতো আগ্রহই সৃষ্টি হোক দৃষ্টি সরিয়ে নিবে।

১.আনফাসে ঈসা,১ম খন্ড,পৃষ্ঠা ১৪২

★★★ পথচলার সময় দৃষ্টি নত রাখুন

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, তখন যেতে যেতে সে দু'আ করলো, হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিন, সুযোগ দিন, অবকাশ দিন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অবকাশ দিলেন, তখন সে অহংকার দেখালো। সে বললো,

لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا بِلِهِمْ

'আমি ঐ বান্দাদের কাছে তাদের ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে যাবো এবং চর্তুদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবো।"১

হযরত বলেন, শয়তান চার দিকের কথা বর্ণনা করেছে। বোঝা গেলো শয়তান এই চারদিক থেকে আক্রমণ করে। কখনো সামনে থেকে, কখনো পিছন থেকে, কখনো ডান থেকে, কখনো বাম থেকে। কিন্তু দুটি দিকের কথা সে বলেনি, ছেড়ে দিয়েছে। এক উপরের দিক, আরেক নীচের দিক। এজন্য উপরের দিক থেকেও নিরাপদ এবং নীচের দিক থেকেও নিরাপদ। এখন যদি উপরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলো তাহলে ধাক্কা খাবে, পড়ে যাবে। এজন্য এখন একটাই মাত্র

রাস্তা বাকি আছে, তা হলো নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের চার দিকের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, নিরাপদে থাকতে পারবে। এ কারণে বিনা প্রয়োজনে ডানে-বামে তাকিও না। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলো। তারপর দেখবে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তোমাকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।''২

খোদ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর তার ফলাফল বলেছেন যে, এর কারণে লজ্জাস্থানের হেফাজত হবে, পবিত্রতা লাভ হবে।

১.সূরা আল আরাফ, আয়াত ১৭
২.সূরা নূর,আয়াত ৩০

★★★ এ কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের চেয়ে কম

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন,

'নফসের যতো কষ্টই হোক সাহস করে এ দুটি বিষয়কে অবলম্বন করবে। কারণ, এ কষ্ট জাহান্নামে আগুনের কষ্টের চেয়ে কম।'

অর্থাৎ, এখন তো দৃষ্টি নত করতে নফসের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই কুদৃষ্টির কারণে জাহান্নামে যেই আযাব হবে, তার কষ্টের তুলনায় এ কষ্ট লাখ-কোটি বরং মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ কম। বরং এখানের কষ্টের সাথে সেখানের কষ্টের কোনো তুলনাই হয় না। কারণ, সেখানের আযাব হলো অন্তহীন, কখনো তা শেষ হবে না। আর এখানের কষ্ট তো শেষ হয়ে যাবে।

★★★ সাহসিকতার সাথে কাজ করুন

এরপর বলেন,
'সাহস করে কয়েকদিন যখন এমন করবে তখন সেদিকে আকর্ষণ কমে যাবে। এটাই চিকিৎসা, এছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। যদিও সারাজীবন উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরুক না কেন।'

কারণ, মানুষ মেহনত ও কষ্ট সহ্য করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ওয়াদা করেছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যে ব্যক্তি আমার পথে মুজাহাদা করবে আমি অবশ্যই তাকে পথ দেখাবো।১

তিনি মুজাহাদা ও সাধনাকারীকে পথ দেখান। এ জন্য মুজাহাদা করে দৃষ্টি নত করো, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আকর্ষণও কমিয়ে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। এটাই চিকিৎসা। এছাড়া কোনো চিকিৎসা নেই। যদিও সারাজীবন দিশেহারা হয়ে ঘুরুক না কেন? মানুষ চায় আমরা যখন শাইখের কাছে যাবো তখন শাইখ এমন এক ফুঁ দিবেন বা এমন এক ব্যবস্থাপত্র দিবেন বা এমন এক ওযীফা পড়তে দিবেন, যার ফলে চোখে আর আকর্ষণ থাকবে না। আরে ভাই! এমনটি হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ হিম্মত করে কাজ না করে।

এ দুটি কাজ করুন! একটি হলো হিম্মত করুন আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহমুখী হোন। হিম্মত ব্যবহার করার অর্থ হলো সাধ্য মতো নিজেকে দূরে রাখুন। আর আল্লাহমুখী হওয়ার অর্থ হলো, যখনই এমন পরীক্ষা সামনে আসবে সাথে সাথে আল্লাহমুখী হোন, আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। আল্লাহকে বলুন, হে আল্লাহ! নিজ দয়ায় আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার চোখকে রক্ষা করুন, আমার চিন্তাকে রক্ষা করুন, আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে তো আমি আক্রান্ত হয়ে যাবো।

১.সূরা আনকাবুদ, আয়াত ৬৯

★★★ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চরিত্র অবলম্বন করুন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন পরীক্ষার শিকার হলেন তখন তিনি এই কাজই করেছিলেন। নিজের তরফ থেকে চেষ্টা করেছিলেন। যখন জুলায়খা চর্তুদিক থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে গোনাহের দাওয়াত দিলো, তখন হযরত

ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ চোখে দেখছিলেন যে, দরজায় তালা লাগানো আছে, বের হওয়ার কোনো পথ নেই। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দরজার দিকে দৌড়ালেন। যখন স্বচক্ষে দেখা যচ্ছে যে, দরজায় তালা লেগে আছে তখন দৌড়ে যাবেন কোথায়? পথ তো নেই। কিন্তু যেহেতু দরজা পর্যন্ত দৌড়ে যেতে তিনি সক্ষম ছিলেন, তাই নিজের সাধ্যের কাজটুকু তিনি করলেন। নিজের ইচ্ছাধীন যা ছিলো, তা তিনি বাস্তবায়ন করলেন। দরজা পর্যন্ত যাওয়ার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করার হকদার হলেন যে, হে আল্লাহ! আমার সাধ্যে তো এতটুকুই ছিলো। এরচে' বেশি তো আমার সাধ্য নেই। এবার সামনে আপনার কাজ। যখন নিজের অংশের কাজ করে আল্লাহর কাছে চাইলেন, হে আল্লাহ! সামনের কাজ আপনার ক্ষমতাভুক্ত, তখন আল্লাহ তা'আলাও নিজের অংশেরটুকু করলেন। তিনিও দরজার তালা ভেঙ্গে দিলেন। এ বিষয়টিই মাওলানা রূমী রহ. খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করে বলেছেন,

گرچه رخنه نیست عالم را پدید

خیره یوسف دار می باید دوید

যদিও তোমার সামনে এই দুনিয়াতে কোন পথ ও আশ্রয়স্থল পাচ্ছো না, চতুদিক থেকে গোনাহের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তুমি পাগলের মতো পালাও। পাগলের মতো এমনভাবে পালাও যেভাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পালিয়েছিলেন। তুমি যতটুকু পালিয়ে যেতে পারো দৌড়াতে পারো ততটুক দৌড়াও, বাকী আল্লাহর কাছে চাও। যাই হোক, মানুষ যদি এ দুটি কাজ করে, এক নিজের সাধ্য মতো কাজ করা, দ্বিতীয় আল্লাহর কাছে চাওয়া, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, দুনিয়াতে কামিয়াবী লাভের মূল কথা এটাই।

★★★ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) খুব বিস্ময়কর বিস্ময়কর কথা বলতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটে রেখেছিলেন। সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ ছিলো না। চর্তুদিকে অন্ধকার। বিষয়টি সাধ্যের বাইরে চলে গেছিলো। তখন তিনি সমস্ত অন্ধকারের ভিতর অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকলেন আর এই কালিমা পড়লেন,

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ

'হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তুমি সব দোষ থেকে পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমিই অপরাধী।"১

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তিনি আমাকে অন্ধকারের ভিতর থেকে ডাকলেন তখন আমি বললাম,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, আমি তার ডাক শুনলাম এবং তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম। সুতরাং তিন দিন পর মাছের পেট থেকে বের হয়ে এলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি এবং দেবো। ২

হযরত ডা. ছাহেব বলতেন, তোমরা একটু চিন্তা করো তো দেখি, আল্লাহ তা'আলা এখানে কেমন কথা বললেন যে, আমি ঈমানদারদেরকেও এভাবে মুক্তি দিবো? সব ঈমানদার কি তাহলে প্রথমে মাছের পেটে যাবে, তারপর সেখানে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নাজাত দিবেন? এ আয়াতের অর্থ কি তাই? এ আয়াতের অর্থ তা নয়। বরং আয়াতের অর্থ হলো, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে অনেক অন্ধকারের ভিতর আক্রান্ত হয়েছিলেন তেমনিভাবে তোমরাও অন্য ধরনের অন্ধকারের মধ্যে আক্রান্ত হতে পারো কিন্তু সেখানেও তোমাদের অবলম্বন। তাই যা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম গ্রহণ করেছিলেন, আর তা হলো আমাকে এই শব্দ দিয়ে ডাকা।

لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ

'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই, আপনি সব ধরনের দোষ থেকে মুক্ত। নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী।"৩

যখন তুমি এই কালিমার মাধ্যমে আমাকে ডাকবে তখন তুমি যে ধরনের অন্ধকারে আক্রান্ত হবে আমি তোমাকে তা থেকে নাজাত দিবো।

এ জন্য যখন নফসের চাহিদার অন্ধকার সামনে আসবে এবং পরিবেশের অন্ধকার সামনে আসবে তখন তুমি আমাকে ডাকো, হে আল্লাহ! এসব অন্ধকার থেকে রক্ষা করুন, এসব অন্ধকার থেকে বের করে দিন, এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। এভাবে যখন দু'আ করবে তখন এই দু'আ কবুল না হওয়া অসম্ভব।

১.সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৮

২.সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৮

৩.সূরা আম্বিয়্, আয়াত ৮৮

★★★সমস্ত গোনাহ থেকে বাঁচার একটাই ব্যবস্থা

কুদৃষ্টি সম্পর্কে এ কয়টি কথা আমি নিবেদন করলাম। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন। শুধু কুদৃষ্টিই নয় দুনিয়াতে যতো গোনাহ আছে, সব গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে নিজের সাহসকে ব্যবহার করা, ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানো, বার বার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করা, আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হওয়া এবং দু'স' করা জরুরী। এই দুটি জিনিস জরুরী। এ দু'টির একটি দিয়ে কাজ হবে না। শুধু যদি দু'আ করতে থাকে আর সাহস করে কাজ না করে তাহলে এই জিনিস লাভ হবে না। যেমন এক ব্যক্তি পূর্বদিকে দৌড়াচ্ছে আর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌঁছিয়ে দিন। আরে তুমি দৌড়াচ্ছো পূর্ব দিকে আর দু'আ করছো পশ্চিমে যাওয়ার! এ দু'আ কিভাবে কবুল হবে? কম পক্ষে প্রথমে নিজে পশ্চিম দিক হয়ে নাও। এরপর তোমার সাধ্যে যতটুকু আছে, তা করো। তারপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করো, হে আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌঁছিয়ে দিন। তখন ঐ দু'আ কাজে আসবে। অন্যথায় ওটা দু'আই নয়। ওটা তো আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা করা।

এজন্য আগে সেদিকে মুখ করুন, সাহস করুন, যতটুকু সম্ভব আগে বাড়ুন, এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। সমস্ত গোনাহ থেকে বাঁচার এটাই ব্যবস্থা। এটাই উপায়। এছাড়া আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই। সমস্ত ইবাদত অর্জন করার ব্যবস্থাপত্রও এই একটাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

★★★প্রকৃত মুজাহিদ কে?

নফল পড়া তো সবাই দেখে। দর্শক মনে করে এ ব্যক্তি বড়ো আবেদ যাহেদ মানুষ। কিন্তু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তার প্রতি যত্নশীল হওয়া এমন জিনিস যা মানুষ বুঝতেও পারে না। যেমন অন্তরে গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হলো, মানুষ তা দমন করলো, সেই চাহিদা অনুপাতে কাজ করলো না, এটা এতো বড়ো জিহাদ, যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

'প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে।"১

এতো বড়ো জিহাদ করলো, অথচ কেউ জানতে পারলো না। এতে কোনো খ্যাতি লাভ হয় না। এতে রিয়ার সম্ভাবনা নেই। এতে রয়েছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ও আপনাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

রমাযানুল মুবারকের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েিেছলো যাতে তোমরা পরহেযগার হয়ে যাও।"২

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোযার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়, গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টার নাম তাকওয়া। এজন্য রমাযান মাসে এই চিন্তা জাগ্রত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা রোযা ও তারাবীহের বরকতে আমাদের অন্তরে এ চিন্তা সৃষ্টি করে দিন। যখন রমাযানের মুবারক মাস শেষ হবে তখনও যেন আমরা নিজেদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারি। আমাদের মধ্যে গোনাহের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে চিন্তা জাগ্রত হয় যে, এটা থেকে বাঁচা জরুরী। যদি চোখের হেফাজত, মুখের হেফাজত, কানের হেফাজত এবং আত্মার হেফাজত করতে পারি, তখন দেখবেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কেমন নূর ও বরকত নাযিল হয়!

১.সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ১৫৪৬
২.সূরা বাকারাহ ১৮৩

★★★পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলো, বলুন তো! এক ব্যক্তি আমল তো কম করে অর্থাৎ নফল ইবাদত ও নফল নামায খুব বেশি পড়ে না, বেশির ভাগ ফরয ওয়াজিব আদায় করে। নফল ইবাদত, যিকির-আযকার, ওযীফা ও তাসবীহ অধিক পাঠ করে না, কিন্তু তার গোনাহ কম। এমন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়, নাকি ঐ ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়, যার নফল ইবাদতও অধিক এবং গোনাহও অধিক। যেমন তাহাজ্জুদ নামাযও পড়ে, ইশরাকও পড়ে, আওয়াবিনও পড়ে, তিলাওয়াতও খুব করে, ওযীফা ও তাসবীহ্-ও খুব পাঠ করে সাথে সাথে

গোনাহের কাজও খুব করে। আপনার নিকট এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? প্রথম ব্যক্তির আমলও কম গোনাহও কম, দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলও বেশি গোনাহও বেশি। উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সমান আমি অন্য কিছুকে মনে করি না। অর্থাৎ, মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে এটা এতো বড়ো নেয়ামত এবং এতো বেশি কল্যাণকর যে, অন্য কোনো আমল এর সমান নয়। গোনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে যত্ন নেয়ার তুলনায় নফল ইবাদতের কোনো গুরুত্ব নেই।

★★★আসল জিনিস গোনাহ থেকে বাঁচা

এই হাদীসে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যতো নফল ইবাদত আছে তা যথাস্থানে অনেক বেশি ফযীলতের জিনিস, কিন্তু এই নফল ইবাদতের উপর ভরসা করে মানুষ যদি চিন্তা করে যে, আমি তো নফল ইবাদত অনেক করি, তাই সে গোনাহ থেকে পরহেয করলো না তাহলে এটা হবে বড়ো ধরনের আত্ম প্রবঞ্চনা। আসল জিনিস হলো গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করা। গোনাহ থেকে বাঁচার পর মনে করুন তার যদি অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করার সুযোগ নাও হয় তাহলেও সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহর নিকট নাজাত পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি নফল ইবাদত খুব করে সাথে অনেক গোনাহও করে তাহলে তার মুক্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার।

★★★আত্মশুদ্ধিকামীদের জন্য প্রথম কাজ

বর্তমানে নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো শাইখের নিকট ইসলাহী সম্পর্ক করতে গেলে ঐ শাইখ তাকে সাথে সাথে বলে দেয় যে, তুমি এই মা'মুলাত পালন করবে, এই পরিমাণ যিকির করবে, এই পরিমাণ তাসবীহ পাঠ করবে। কিন্তু হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর নিয়ম এই ছিলো যে, তাঁর কাছে যখন কোনো ব্যক্তি আতাশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আসতো তখন তাকে যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল কিছু দিতেন না। সর্বপ্রথম বলতেন, গোনাহ ছাড়ো। এ পথে সর্বপ্রথম কাজ হলো পরিপূর্ণ তাওবা করা। মানুষকে সর্বপ্রথম সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। বলতে হবে, হে আল্লাহ! ইতিপূর্বে যতো গোনাহ আমার দ্বারা হয়েছে মেহেরবানী করে আপনি সেগুলো মাফ করে দিন। আমি আগামীর জন্য সংকল্প করছি, ভবিষ্যতে আর এসব গোনাহ করবো না। অতপর ভবিষ্যতে এসব গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিবে। ধুমাত্র প্রসিদ্ধ কিছু গোনাহ থেকে বাঁচার যত্ন নিলে হবে না। প্রত্যেক গোনাহই গোনাহ। প্রত্যেক গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'বাহ্যিক গোনাহও ছাড়ো এবং অভ্যন্তরীণ গোনাহও ছাড়ো।'

এরপর বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُوْنَ

'যারা গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় কিয়ামতের দিন তাদেরকে সে সব কাজের শাস্তি দেওয়া হবে যা তারা দুনিয়াতে করতো।"১

১.সূরা আনআম,আয়াত ১২০

★★★সব ধরনের গোনাহ ত্যাগ করুন!

এজন্য কোনো গোনাহই এমন নেই, যার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যায়। না জাহেরী গোনাহ, না বাতেনী গোনাহ। এমন যেন না হয় যে, কিছু মোটা মোটা গোনাহ তো ছেড়ে দিলো কিন্তু অবশিষ্ট গোনাহ ছাড়ার দিকে কোনো মনযোগ নেই। যেমন মজলিসে গীবত করা হচ্ছে, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলা হচ্ছে, অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে, কিংবা অন্তরে অহঙ্কার ভরা। সম্পদের ভালোবাসা, পদ পদবীর ভালোবাসা, দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে পরিপূর্ণ। তাহলে তো গোনাহ ছাড়া হলো না। প্রত্যেক এমন কাজ, যাকে আল্লাহ ও রাসূল গোনাহ সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো ত্যাগ করতে হবে। সে বিষয়ে মানুষকে চিন্তাশীল হতে হবে।

★★★গোনাহ কী জিনিস?

এ সব গোনাহ কী জিনিস? গোনাহের পরিণতি কী হয়? প্রথমে এটা জানা । জরুরী। গোনাহের অর্থ হলো অবাধ্যতা। যেমন আপনার বড়ো কেউ আপনাকে আদেশ করলো, এ কাজটি এভাবে করো। আপনি বললেন, আমি করবো না। বা বড়ো কেউ বললো, এ কাজ থেকে বিরত থাকো। আপনি বললেন, আমি এ কাজ অবশ্যই করবো। বড়োর কথা না মানাকেই নাফরমানী ও অবাধ্যতা বলে। এই নাফরমানী যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের ক্ষেত্রে করা হয় তাহলে তার নামই হলো গোনাহ। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর প্রভাব এতো সুদূর প্রসারী, এতো খারাপ ও এতো জঘন্য যে, তা অনুমান করাও কঠিন।

গোনাহের প্রথম খারাবি অকৃতজ্ঞতা

গোনাহের প্রথম খারাবি অকৃতজ্ঞতা। যেই দয়ালু সত্তা মানুষকে অস্তিত্ব দান করলেন। মানুষ সর্বদা তাঁর নেয়ামতের ভিতর নিমজ্জিত। মাথা থেকে পাতা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ তার উপর বর্ষিত হচ্ছে। দেহের একেকটি অঙ্গ নিয়ে চিন্তা করুন যে, এর মূল্য কতো! এর গুরুত্ব কতো! এসব নেয়ামত বিনামূল্যে লাভ হয়েছে, অথচ এর জন্য অন্তরে কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহ না করুন, কোনো সময় যদি এসব অঙ্গের একটি অঙ্গও ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন বুঝে আসবে যে, তা কতো বড়ো নেয়ামত এবং এই ক্ষতি কতো বড়ো ক্ষতি! এই চোখ কতো বড়ো নেয়ামত! এই কান কতো বড়ো নেয়ামত! এই জিহ্বা কতো বড়ো নেয়ামত! এই সুস্থতা কতো বড়ো নেয়ামত! এই রিযিক, যা সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা দান করছেন তা কতো বড়ো নেয়ামত! যেই বিরাট দয়ালু ও করুণাময়ের অসংখ্য নেয়ামত আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে আছে, তিনি শুধু এ কথা বলেছেন যে, তোমরা মাত্র কয়েকটি জিনিস থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তোমার দ্বারা এই সামান্য কাজটুকুই হয় না। এজন্য গোনাহের সর্বপ্রথম খারাপ দিক হলো অকৃতজ্ঞতা, নাশুকরি ও দয়াময়ের হক আদায় না করা।

★★★গোনাহের দ্বিতীয় খারাবি অন্তরে মরিচা পড়া

গোনাহের দ্বিতীয় খারাবি এই যে, হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যখন প্রথমবার গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগিয়ে দেয়া হয়। সেই দাগের হাকীকত তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। যখন দ্বিতীয় গোনাহ করে তখন দ্বিতীয় দাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়। যখন ততীয় গোনাহ করে তখন তৃতীয় দাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে যদি সে তাওবা করে তাহলে এসব দাগ মুছে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাওবা না করে অব্যাহতভাবে গোনাহ করতেই থাকে তাহলে আস্তে আস্তে ঐ কালো দাগ তার পুরো আত্মাকে আচ্ছন্ন করে। তখন ঐ দাগ মরিচার রূপ ধারণ করে। অন্তরে মরিচা লেগে যায়। যখন অন্তরে মরিচা পড়ে যায় তখন হক কথা মানার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার উপর এমন গাফলত আচ্ছন্ন করে যে, তখন গোনাহের অনুভূতি দূর হয়ে যায়। গোনাহের অনিষ্টতা ও অকল্যাণের বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের বুদ্ধি যেন নষ্ট হয়ে যায়।'

★★★গোনাহের চিন্তার ক্ষেত্রে মুমিন ও ফাসেকের পার্থক্য

এক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যেই মুমিন এখনো গোনাহে অভ্যস্ত হয়নি, সে গোনাহকে এমন মনে করে যেমন তার মাথার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। আর পাপী ব্যক্তি গোনাহকে এমন হালকা ও মামুলী মনে করে, যেমন নাকের উপর মাছি এসে পড়েছে আর সে হাত মেরে তা উড়িয়ে দিলো। অর্থাৎ, সে গোনাহকে খুব মামুলি মনে করে। গোনাহ করার পর এজন্য তার কোন অনুশোচনা ও অনুতাপ জাগে না। কিন্তু একজন মুমিন যাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের বরকত দান করেছেন, সে গোনাহকে একটি পাহাড় মনে করে। ভুলে কোনো গোনাহের কাজ হয়ে গেলে তার মাথার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সে দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হয়।

★★★নেককাজ ছুটে গেলে ঈমানদারদের অবস্থা

গোনাহ তো দূরের কথা, একজন মুমিনের যদি নেক কাজ করার সুযোগ লাভ হয়, আর সেই সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলেও তার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। হায়! নেক কাজ করার সুযোগটি লাভ হয়েছিলো কিন্তু আফসোস তা আমার হাতছাড়া হয়ে গেলো। এ সম্পর্কে মাওলানা রুমী রহ. বলেন,

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر زباغ دل خلال کم بود

অর্থাৎ আল্লাহর পথের পথিকের আত্মার বাগান থেকে একটি কুটা পরিমাণ জিনিসও কমে গেলে অর্থাৎ নেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলো কিন্তু সে নেকী করতে পারেনি তখন তার আত্মার উপর দুঃখের হাজার হাজার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। আফসোস! আমার এই নেককাজটি ছুটে গেলো। নেক কাজ ছুটে গেলে যদি এই পরিমাণ ব্যথা হয় তাহলে গোনাহের কাজ হয়ে গেলে কি পরিমাণ ব্যাথা হবে! তখন তো এরচে' অধিক বেদনা হবে। আল্লাহ তা'আলা এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন যে, গোনাহের কারণে অন্তরে দাগ লাগতে থাকার ফলে গোনাহকে এতো সাধারণ মনে করে, যেমন নাকের উপর মাছি এসে বসলো আর সে তা উড়িয়ে দিলো। গোনাহের জন্য তার কোনো দুঃখ-বেদনাই হয় না। যাইহোক, গোনাহের একটি খারাপ দিক এই যে, তা মানুষকে গাফেল বানিয়ে দেয়। এর ফলে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়।

★★★গোনাহের তৃতীয় খারাবি অন্ধকার

আমরা গোনাহের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এজন্য গোনাহের অন্ধকার ও ঘৃণা আত্মা থেকে মুছে গেছে। অন্যথায় প্রত্যেক গোনাহের মধ্যে এমন অন্ধকার ও ঘৃণা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে সঠিক ও পরিপূর্ণ ঈমান দান করেন তাহলে সে এই অন্ধকার ও ঘৃণাকে সহ্য করতে পারবে না। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানুতুবী রহ. বলেন, একবার ভুলক্রমে হারাম আয়ের একটি লোকমা আমার মুখে চলে যায়। এর কারণ এই হয়েছিলো যে, এক ব্যক্তি দাওয়াত করলে তিনি তার ওখানে খানা খেতে যান। পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, তার আয় ছিলো হারাম। তিনি বলেন, দুই মাস পর্যন্ত ঐ হারাম খাদ্যের অন্ধকার আমার অন্তরে অনুভব করতাম। এই অন্ধকারের ফলে ঐ দুই মাস অন্তরে বার বার গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে। কখনো এই গোনাহ করতে মন চাইত, কখনো ঐ গোনাহ করতে মন চাইত। এ সব ছিলো একটি গোনাহের প্রভাব ও অন্ধকার।

★★★গোনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত

আমাদের অন্তরে গোনাহের অন্ধকার এজন্য অনুভূত হয় না যে, আমরা এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দুর্গন্ধময় তার মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পঁচা জিনিস ঐ ঘরে পড়ে আছে। বাহির থেকে কোনো ব্যক্তি ঐ ঘরে গেলে সেখানে সামান্য সময় দাঁড়ানোও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ঐ ঘরেই বসবাস করে, তাহলে ঐ দুর্গন্ধ তার অনুভব হবে না। কারণ, সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার সুগন্ধ আর দুর্গন্ধের বোধশক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে আরামে ঐ বাড়িতে কাট বাস করে। কেউ যদি তাকে বলে, তুমি এমন নোংরা ও দুর্গন্ধ ঘরে বাস আও করো! তাহলে সে তাকে পাগল বলবে। বলবে, আমি তো খুব আরামে একি বাড়িতে রয়েছি। এখানে কোনো প্রকার কষ্ট নেই। কারণ ঐ ব্যক্তি এই দুর্গন্ধে এতি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঐ দুর্গন্ধ থেকে হেফাজত করেছেন, বরং সুগন্ধ পরিবেশে রেখেছেন, তার অবস্থা তো এমন হবে যে, দূর থেকে সামান্য দুর্গন্ধ আসলেও তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং যাদের আত্মা তাকওয়ার কারণে আয়নার মতো স্বচ্ছ, তারা গোনাহের অন্ধকারকে ও ঘৃণা করেন ও তা খুব বেশি অনুভব করেন। মোটকথা, গোনাহের তৃতীয় বড়ো খারাবি ও পরিণতি অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হওয়া।

★★★গোনাহের চতুর্থ খারাবি বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়া

গোনাহের চতুর্থ খারাবি এই যে, মানুষ যখন গোনাহ করতে থাকে তখন তার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। তার মত উল্টা হয়ে যায়। তার চিন্তা ও বুঝ ভুল পথে পরিচালিত হয়। তখন সে ভালো জিনিসকে খারাপ এবং খারাপ জিনিসকে ভালো মনে করতে আরম্ভ করে। তাকে যদি সঠিক কথাও নরমভাবে বুঝানো হয় তাহলে তা তার মগজে ঢুকবে না। তার সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তার হেদায়েতের কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা অহেতুক কাউকে বিপথগামী করেন না। কোনো মানুষ অব্যাহতভাবে নাফরমানী করতে থাকলে তার অকল্যাণে সঠিক কথা তার বুঝেই আসে না।

★★★বান্দা তো সেই, যে হুকুম পালন করে

মাহমুদ গজনবীর হুকুমের কি মূল্য আছে! তার নিজের বুদ্ধিও সীমিত। তার উযীর ও আয়াযের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ। এ অবস্থান তো রয়েছে মূলত সেই সত্তার, যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। হীরা ভেঙ্গে যাক, দিল ভেঙ্গে যাক, মানুষের আবেগ-উদ্দীপনা ভেঙ্গে যাক, কামনা-বাসনা ভেঙ্গে যাক, চিন্তা ও কল্পনা ভেঙ্গে যাক, কিন্তু তাঁর হুকুম যেন না ভাঙ্গে। এই মর্যাদা মূলত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এ কারণে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মধ্যে হিকমত ও রহস্য তালাশ করা নির্বুদ্ধিতা। আর এই নির্বুদ্ধিতার মুল কারণ গোনাহ। যতো গোনাহ করবে, ততো বুদ্ধি উল্টে যাবে। মোটকথা, গোনাহের অকল্যাণে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

★★★গোনাহ ছাড়লে নূর লাভ হয়

আল্লাহ তা'আলার দরবারে এসব গোনাহ থেকে সামান্য সময়ের জন্য তাওবা করেই দেখুন! কয়েকদিনের জন্য গোনাহ ছেড়ে দেখুন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কেমন নূর ও বরকত লাভ হয়! তখন এমন সব কথা বুঝে আসবে, যা পূর্বে বুঝে আসতো না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার হারাম করা গোনাহ থেকে বাঁচো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার একটি নিক্তি সৃষ্টি করবেন। যা সুস্পষ্টভাবে তোমাদেরকে বলে দিবে, এটা হক এটা বাতিল। এটা

ঠিক, এটা ভুল। আজ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যও মিটে গেছে। কারণ, আমরা গোনাহ করে নিজেদের বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছি।

★★★গোনাহের পঞ্চম ক্ষতি বৃষ্টি বন্ধ হওয়া

গোনাহের পঞ্চম ক্ষতি এই যে, গোনাহের আসল শাস্তি তো আখেরাতে হবে তবে এই দুনিয়াতেও গোনাহের অশুভ প্রভাব গোনাহগারের জীবনের উপর পতিত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।

★★★গোনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি রোগ সৃষ্টি হওয়া

গোনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি এই যে, মানুষের মধ্যে যখন অশ্লীলতা, নগ্নতা ও অপকর্ম বিস্তার লাভ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সব ব্যাধিতে আক্রান্ত করেন, যেগুলো সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষ কখনো শোনেনি যে, এমন রোগও হয়ে থাকে। এ হাদীসকে সামনে রেখে এইডস রোগের দিকে লক্ষ করুন, আজ সারা পৃথিবীতে যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলে গেছেন এমন সব রোগ দেখা দিবে। প্রত্যেক গোনাহের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর বর্হিপ্রকাশ এই দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেগুলো চোখের সামনে দেখিয়ে দেন। গোনাহের অশুভ পরিণতি এভাবে আচ্ছন্ন করে।

★★★গোনাহের সপ্তম ক্ষতি খুন-খারাবি

হাদীস শরীফে আছে,يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ، فَقِيلَ: كَيْفَ

يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ :الْهَرَجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

'শেষ জামানায় এমন এক সময় আসবে, যখন খুন-খারাবির বিস্তার ঘটবে। মানুষ হত্যা করা হবে, কিন্তু হত্যাকারীও জানবে না কেন সে হত্যা করলো এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না কি কারণে তাকে হত্যা করা হলো? তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামে যাবে।'
আগের জামানায় কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটলে জানা যেতো যে, শত্রুতা ছিলো এজন্য হত্যা করা হয়েছে।

হাদীসটি পড়ুন আর বর্তমান যুগে যে সব হত্যাকাণ্ড ঘটছে সেদিকে দেখুন, মানুষ কিভাবে মরছে! আজ যদি কেউ নিহত হয় আর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন হত্যা করা হয়েছে, কে হত্যা করেছে, তাহলে কারো কাছে তার উত্তর নেই। মনে হয় যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বে বর্তমান যুগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এ কথা বলেছেন। এগুলো আমাদের পাপের ফল ও বদ আমলের পরিণতি। গোনাহের আধিক্য এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

★★★ওযীফার চেয়ে গোনাহ ছাড়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত

মোটকথা, অধিক নফল ইবাদতে নিমগ্ন তো ভালো কাজ, কিন্তু এর চেয়ে অধিক জরুরী কাজ হলো গোনাহ থেকে বাঁচা। আমার কাছে প্রতিদিন অনেক মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের ফোন আসে যে, অমুক কাজের দু'আ বলে দিন, অমুক উদ্দেশ্য সাধনের দু'আ বলে দিন। কতক মহিলার ধারণা প্রত্যেক উদ্দেশ্য সাধনের পৃথক দু'আ রয়েছে, পৃথক ওযীফা আছে। আরে ভাই! এসব দু'আ ও ওযীফার ফযীলত রয়েছে, কিন্তু যাতে গোনাহ না হয় এ বিষয়ে অধিক যত্নশীল হওয়া দরকার। নিজেও গোনাহ থেকে বাঁচুন, নিজের পরিবার-পরিজন এবং সন্তানদেরকেও গোনাহ থেকে বাঁচান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত মনে রাখবেন এসব ওযীফা কোনো কাজে আসবে না। ওযীফা তখন কাজে আসে, যখন অন্তরে গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির ও তার উদ্দীপনা থাকে। গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যখন গুরুত্ব থাকে তখন এ সমস্ত ওযীফা ও দু'আর দ্বারা অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চার হয়। ফলে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়। কিন্তু যদি গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টা না থাকে, গাফলতীর মধ্যে সময় কাটে, সাথে ওযীফা ও নফল চলতে থাকে, তখন এসব ওযীফা দ্বারা কোনো ফায়দা হয় না।

★★★মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত।

অপর একটি হাদীস হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন মুমিন এবং তার ঈমানের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি ঘোড়া লম্বা রশি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাধা রয়েছে, যার ফলে ঐ ঘোড়া ঘুরতে থাকে কিন্তু একটি সীমানায় গিয়ে ঐ খুঁটি তাকে আটকিয়ে ফেলে। ঐ ঘোড়া সামান্য চক্কর দিয়ে আবার ফিরে এসে ঐ খুঁটির নিকট বসে পড়ে। এভাবে ঐ খুঁটি দুটি কাজ করে। একটি হলো, সে ঘোড়াকে বিশেষ একটি সীমানা থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। দ্বিতীয় হলো, ঐ খুঁটি ঘোড়াটির আশ্রয়স্থল হয়। ঘোড়া এদিক সেদিক চক্কর লাগিয়ে আবার ঐ খুঁটির কাছে এসেই বসে পড়ে।'[১]

এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের খুঁটি হলো তার ঈমান। ঈমানের দাবি হলো, মুমিন ব্যক্তি একটি সীমা পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরবে, চক্কর দিবে, কিন্তু সীমার চেয়ে আগে বাড়তে চাইলে ঈমান তার রশি টেনে ধরবে। এদিক সেদিক ঘোরার পর অবশেষে মুমিন ব্যক্তি তার ঈমানের খুঁটির কাছে ফিরে আসবে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, মুমিন ব্যক্তির ঈমান এতো শক্তিশালী হয় যে, সে তাকে গোনাহ করতে দেয় না। কখনো ভুলে গোনাহ হয়ে গেলে ফিরে আবার সে ঈমানের খুঁটির কাছে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের এই খুঁটিকে শক্তিশালী করে দিন।

১.মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং ১০৯০৭

★★★গোনাহ লিখতে বিলম্ব করা হয়।

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুজন ফেরেশতা রয়েছে। একজন নেকী লেখে, আরেকজন বদী লেখে। আমি আমার শাইখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব (কু.সি.) থেকে শুনেছি যে, নেকী লেখক ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, মানুষ যখন নেক কাজ করে তখন সাথে সাথে তা লিখে ফেলবে। আর বদী লেখক ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, মানুষ গোনাহের কাজ করলে তা লেখার পূর্বে নেকী লেখক ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করবে, লিখবো কি লিখবো না? নেকী লেখক ফেরেশতা যেন তার আমীর। সুতরাং মানুষ যখন কোনো গোনাহ করে, তখন বদী লেখক ফেরেশতা নেকী লেখক ফেরেশতার কাছে জিজ্ঞাসা করে, লিখবো কি লিখবো না? নেকী লেখক ফেরেশতা বলে, না এখনই লিখো না। কারণ, এ ব্যক্তি তাওবা করতে পারে, ইস্তিফগার করতে পারে। তাহলে লেখার আর প্রয়োজনই হবে না। ঐ ব্যক্তি যদি আবারো গোনাহ করে এবং পূর্বের গোনাহ থেকে তাওবা না করে, তখন আবারও জিজ্ঞাসা করে, এখন লিখি? নেকী লেখক ফেরেশতা বলে, না আরেকটু দেরি করো। তারপর যখন তৃতীয়বার গোনাহ করে তখন আবারো জিজ্ঞাসা করে, লিখবো কি লিখবো না? তখন নেকী লেখক ফেরেশতা বলে, হ্যাঁ, এখন লিখো। তারপর ঐ গোনাহ তার আমলনামায় লেখা হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি এতো সহজ ব্যবস্থা করেছেন। নেককাজ তো সাথে সাথে লেখা হয়, কিন্তু গোনাহের কাজ লিখতে বিলম্ব করা হয়, হয়তো সে তাওবা করবে।

★★★যেখানে গোনাহ করেছেন, সেখানেই তাওবা করুন।

এ কারণে বুযুর্গগণ বলেন, যখনই কোনো গোনাহ সংঘটিত হবে, তখনই অবিলম্বে তাওবা ও ইস্তেগফার করবে। যাতে করে এ গোনাহ তোমার আমল নামায় লেখাই না হয়। বুযুর্গগণ আরো বলেন, যেই জায়গায় গোনাহ করেছো, সেই জায়গাতেই অবিলম্বে তাওবা ও ইস্তিগফার করো। যাতে করে । কিয়ামতের দিন যখন ঐ জায়গা তোমার গোনাহের সাক্ষ্য দিবে, সাথে সাথে যেনো তোমার তাওবারও সাক্ষ্য দেয়। এ ব্যক্তি আমার বুকের উপর গোনাহ করেছিলো, পরবর্তীতে আমার বুকের উপর তাওবাও করেছিলো। এগুলো হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের উপর আমল যে, রমান মুমিনের খুঁটি স্বরূপ। মুমিন যখন এদিক সেদিক চলে যায়, তখন ঘুরে ফিরে আবার নিজের খুঁটির কাছেই চলে আসে।

★★★গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিন।

এজন্য প্রথমত গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টা করবে। চিন্তা চেষ্টা ছাড়া গোনাহ থেকে বাঁচা যায় না। চিন্তা-চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো অপারগতার কারণে যা ভুল ক্রমে গোনাহ হয়ে গেলে অবিলম্বে তাওবা করুন। ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। এভাবে করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলার রহমতের কাছে আশা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এই গোনাহ মাফ করে দিবেন। উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব সবচেয়ে বড়ো আপদের কথা। মানুষের মধ্যে চিন্তা-চেষ্টা থাকবে না এবং গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি মনযোগ থাকবে না, বরং গোনাহের কারণে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেই তা সঠিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে, এটা অত্যন্ত মারাত্মক ও বিপজ্জনক অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা অমাকে এবং আপনাদের সকলকে গোনাহের আপদ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

★★★আল্লাহর ভয় গোনাহের প্রতিষেধক

যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পেলো- একদিন তাকে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে, নিজের একেকটি আমলের জওয়াব দিতে হবে, এই ভয় পোষণ করলো- তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। **১**

এ আয়াতের তাফসীরে বিখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, এ আয়াতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার অন্তরে কোনো গোনাহের কাজ করার ইচ্ছা জাগলো আর সাথে সাথে সে আল্লাহর কথা চিন্তা করলো। স্মরণ করলো যে, একদিন আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এ কথা স্মরণ হওয়ার পর সে ঐ গোনাহের ইচ্ছা ত্যাগ করলো, ঐ গোনাহ করলো না। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য দুটি জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।

১.সূরা আর রহমান, আয়াত ৪৬

★★★এর নাম 'তাকওয়া'

এর আরো তাফসীর করে বলেন, এক ব্যক্তি নির্জনে অবস্থান করছে। তাকে দেখার মতো সেখানে কেউ নেই। সেখানে কোনো গোনাহ করতে চাইলে বাহ্যিকভাবে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। সেই নির্জন জায়গায় তার অন্তরে গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হলো। কিন্তু সে চিন্তা করলো যে, কোনো মানুষ যদিও আমাকে দেখছে না, কিন্তু আমার আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন। একদিন আমাকে তার সামনে দাঁড়াতে হবে। এ কথা চিন্তা করে সে ঐ গোনাহের কাজ ছেড়ে দিলো। এমন ব্যক্তির জন্যই এ আয়াতে দুই জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। আর এরই নাম তাকওয়া। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করে নিজের প্রবৃত্তির শক্তিশালী ও সুদৃঢ় চাহিদাকে ত্যাগ করার নামই তাকওয়া। সে চিন্তা করে যে, দুনিয়ার মানুষ যদিও আমাকে দেখছে না, কিন্তু একজন আমাকে ঠিকই দেখছেন। সমস্ত তরীকত ও শরীয়তেরও সার-নির্যাস এটাই যে, অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে যে, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে।

★★★আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করলো বা আযাবকে ভয় করলো বা আগুনকে ভয় করলো বরং বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করলো। যার অর্থ এই যে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। সে চিন্তা করে, এ গোনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা আযাব দেন বা না দেন, কিন্তু আমি আল্লাহর সামনে এই গোনাহ করে কিভাবে দাঁড়াবো? যার অন্তরে কারো প্রতি সমীহ থাকে, তার মারার বা শাস্তি দেওয়ার ভয় না থাকলেও এই সমীহের কারণে তার অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় যে, তার সন্তুষ্টির পরিপন্থী কাজ করে তার সামনে গিয়ে আমি কিভাবে তাকে মুখ দেখাবো? এই ভয়ের নাম তাকওয়া।

★★★সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভয় ও অনুভূতিই সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে জাগ্রত করেছিলেন। এর ফলে কারো দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন এবং নিজের উপর শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাকুতি মিনতি করে মাফ না চাওয়া পর্যন্ত এবং তাওবা না করা পর্যন্ত তারা শান্তি পেতেন না। অপরাধী নিজে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে

নিজের উপর শাস্তি বাস্তবায়ন করাতো। বলতো, হে আল্লাহর রাসূল! যে কোনো উপায়ে হোক আমাকে পাক করুন। এজন্য যে পর্যন্ত অন্ত রে আল্লাহর ভয় এবং আখারাতের ফিকির না জন্মাবে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি না জাগবে সে পর্যন্ত দুনিয়া থেকে অপরাধ নির্মূল হতে পারে না। এর জন্য যতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন।

★★★গোনাহের চাহিদা হলে এ কথা চিন্তা করুন!

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন, মানুষ যদি আল্লাহর কথা চিন্তা করতে চায় তাহলে অনেক সময় আল্লাহর চিন্তা ও কল্পনা অন্তরে আসতে চায় না। কারণ, মানুষ তো কখনো আল্লাহকে দেখেনি। আর কল্পনা করা যায় এমন জিনিসের, যাকে মানুষ দেখেছে। এ কারণে আল্লাহর কথা কল্পনা করতে কষ্ট হয়। এজন্য যখন গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে তখন অন্য একটি জিনিসের কথা কল্পনা করবে। আর তা হলো, আমি যেই গোনাহ করার ইচ্ছা করছি ঐ গোনাহ করার সময় যদি আমার বাবা আমাকে দেখে বা আমার সন্তান আমাকে দেখে বা আমার ওস্তাদ আমাকে দেখে বা আমার ছাত্র আমাকে দেখে বা আমার বন্ধু-বান্ধব আমাকে দেখে, তাহলে তখনও কি এই গোনাহের কাজ আমি করবো?

উদাহরণস্বরূপ, নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টিপাত করার চিন্তা অন্তরে জাগছে। তখন চিন্তা করবে যে, এ সময় যদি আমার শাইখ আমাকে দেখেন বা আমার বাবা আমাকে দেখেন বা আমার সন্তান আমাকে দেখে তাহলে কি তখনও নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টিপাত করবো। বলাবাহুল্য যে, দৃষ্টিপাত করবো না। কারণ, আমার ভয় রয়েছে যে, এদের কেউ যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখে তাহলে তারা আমাকে খারাপ মনে করবে। তাহলে যখন সাধারণ পর্যায়ের মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে নিজের কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করি, দৃষ্টিকে সংযত করি; তাহলে প্রত্যেক গোনাহের সময় এ কথা চিন্তা করুন যে, আল্লাহ তা'আলা, যিনি মালিকুল মুল্ক, যিনি তাদের সকলের স্রষ্টা ও মালিক, তিনি আমাকে দেখছেন। এ কথা চিন্তা করার দ্বারা ইনশাআল্লাহ অন্তরে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

★★★গোনাহের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী

মানুষ যখন গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন প্রথম প্রথম গোনাহ থেকে বাঁচতে তার কষ্ট হয়। গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয় না। কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার চিকিৎসা এটাই যে, জোরপূর্বক নিজেকে গোনাহ থেকে দূরে রাখবে। আল্লাহর খাতিরে গোনাহের বাসনাকে নিষ্পেষিত করবে। যখন সে আল্লাহর খাতিরে নিজের কামনাকে দমন করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে

রমানের এমন মধুরতা দান করবেন যে, তার তুলনায় গোনাহের স্বাদ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচার মধুরতা দান করুন।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ, বলতেন, গোনাহের স্বাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন চুলকানিগ্রস্থ ব্যক্তির চুলকানিতে স্বাদ লাগে। কিন্তু তা সুস্থতার স্বাদ নয়। অসুস্থতার স্বাদ। অধিক চুলকানোর কারণে ঐ জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হবে। ক্ষত এবং জ্বলার কারণে যেই কষ্ট হবে, তার তুলনায় চুলকানির স্বাদের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু চুলকানো থেকে যদি দূরে থাকে আর চিন্তা করে যে, চুলকানোর পর অধিক কষ্ট হবে। এজন্য না চুলকিয়ে যদি তার উপর মলম লাগাই এবং তিতা ঔষধ সেবন করি তাহলে ঔষধ সেবনে কষ্ট হলেও পরিণতিতে চুলকানি থেকে মুক্তি লাভ হবে। তারপর সুস্থতার স্বাদ অর্জন হবে। সুস্থতার স্বাদ চুলকানির স্বাদের চেয়ে হাজার গুণ উন্নত হবে। ঠিক একইভাবে গোনাহের স্বাদ একেবারেই মূল্যহীন। ধোঁকার জিনিস। এই স্বাদকে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিন। এর পরিবর্তে তাকওয়ার স্বাদ অর্জন করুন। তারপর দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কতো উর্ধ্বে নিয়ে যান। প্রবৃত্তির এসব চাহিদা সৃষ্টিই করা হয়েছে নিষ্পেষিত করার জন্য এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এ কথার হাকীকত আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিন।

★★★যৌবনকালে ভয় ও বৃদ্ধকালে আশা

একজন মুমিন আল্লাহর প্রতি ভয়ও পোষণ করবে, আবার একই সঙ্গে আশাও পোষণ করবে। তবে বুযুর্গগণ বলেছেন, যৌবনকালে ভয়ের প্রাবল্য ভালো। কারণ, যৌবনকালে যখন হাত-পা সচল থাকে, শক্তি সবল থাকে, সব ধরনের কাজ করতে মানুষ সক্ষম হয়, তখন অন্তরে গোনাহের চাহিদা হয় বেশি। গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী জিনিস বেশি হয়ে থাকে। এজন্য এসময় তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা অধিক কল্যাণকর। যাতে এ ভয় তাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। তবে যখন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে শেষ বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা প্রবল হওয়া উচিত। যাতে সে নিরাশার শিকার না হয়।

★★★আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন

মোটকথা, ভয় এমন এক জিনিস, যার উপর সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। এই ভয়ের অভাবে নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা ও অরাজকতার বাজার উত্তপ্ত হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বার বার বলেছেন,

إِتَّقُوا اللَّهَ إِتَّقُوا اللَّهَ

তাকওয়া অবলম্বন করো।' তাকওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যেমন ভয় ছাড়া অচল, একইভাবে দ্বীনের ভিত্তিও আল্লাহর ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ না করুন, এই ভয় আত্মা থেকে বের হয়ে গেলে বা তা হ্রাস পেলে গোনাহ ব্যাপক আকার ধারণ করবে। যেমন বর্তমানে আমরা নিজ চোখে দেখছি। কুরআনে কারীমের কোথাও জান্নাতের আলোচনা আছে, কোথাও জাহান্নামের আলোচনা আছে, কোথাও আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর কুদরতের আলোচনা আছে, যাতে করে প্রত্যেক মুসলিম এসব বিষয়ে বার বার চিন্তা করে। এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়। এবং এগুলোর মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে।

★★★নির্জনে আল্লাহর ভয়

পুলিশের ভয়, আইনের ভয়, শাস্তির ভয় বা জেলের ভয় এমন জিনিস যা শুধুমাত্র অন্য মানুষের সামনে অপরাধ করতে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু যখন আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থান করে নেয় তখন বনের নির্জনে এবং রাতের অন্ধকারে, যখন আর কেউ দেখার থাকে না, সেখানেও সেই ভয় মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। মনে করুন! রাতের অন্ধকার বিরাজ করছে, বনের নির্জনতা বিরাজ করছে, দেখার মতো কেউ উপস্থিত নেই, তখন যদি কোনো ঈমানদার গোনাহ থেকে বাঁচে তাহলে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কিছুই নাই যা তাকে গোনাহ থেকে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহর ভয়ই তাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখছে।

★★★সর্বত্র আল্লাহর এই ভয় সৃষ্টি করুন

শরীয়তের দাবী হলো যেভাবে রোযার অবস্থায় বন্ধ কক্ষে আল্লাহর ভয় আপনাকে পানি পান করা থেকে বাধা দিচ্ছে ঠিক একইভাবে কুদৃষ্টির যদি প্রচণ্ড চাহিদা হয়, হারাম জায়গায় দৃষ্টি পড়তে চায়, তখন সে প্রচণ্ড চাহিদাকেও আল্লাহর ভয়ে দমন করে নিজের দৃষ্টিকে আটকে রাখুন। একইভাবে গীবত করতে বা মিথ্যা বলতে প্রচণ্ড চাহিদা হচ্ছে তো যেভাবে রোযার অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে পানি পান করা থেকে বিরত ছিলেন এমনিভাবে এখানেও গীবত এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকুন। এটা হলো আল্লাহর ভয়। এই জিনিস যখন অন্তরে সৃষ্টি হয় তখন মানুষ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর মর্জির খেলাফ কাজ করে না। শরীয়তে এই আল্লাহর ভয়ই কাম্য।

★★★জান্নাত কার জন্য?

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজের নফসকে মন্দ কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।১

কি বিস্ময়কর শব্দ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন! তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পরওয়ারদেগারের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করলো যে, আমাকে একদিন আমার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে তখন কোন মুখ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবো। আর এই ভয় তার এতো তীব্র হলো যে, এই ভয়ের ফলে সে তার নফসের অবৈধ চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকলো, তাহলে এমন ব্যক্তির ঠিকানা হবে জান্নাত। এমন ব্যক্তির জন্যই জান্নাত তৈরী করা হয়েছে।

জান্নাতের চর্তুদিকে কষ্টের আবরণ রয়েছে এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ

'জান্নাতকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব জিনিস দ্বারা পরিবেষ্টন করেছেন যা মানুষের কাছে খারাপ লাগে।"২

অর্থাৎ, কষ্টকর ও পরিশ্রমের কাজ যা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে, এমন সব জিনিস দ্বারা জান্নাতকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। আপনি এসব কষ্টকর কাজ করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। এজন্য বলা হয়েছে যে, অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন, এর ফলে নাজায়েয কামনা বাসনার উপর আমল করা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। পরিণতিতে জান্নাত লাভ হবে। এই ভয় এই পর্যায়ের হতে হবে, যেন নিজের সব কাজ, সব কথার মধ্যে এই ভয় লেগে থাকে যে, এটা আমার মালিকের মর্জির খেলাফ যেন না হয়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের ভয়ের অবস্থা এই ছিলো যে, তাদের ঐ সময় পর্যন্ত শান্তি লাভ হতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের উপর শাস্তি বাস্তবায়ন না করাতেন।

১.সূরা নাযিয়াত,আয়াত ৪০-৪১

২.সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৪৯

★★★নেক বান্দাগণের অবস্থা

অপর এক জায়গায় নেক বান্দাগণের আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'আল্লাহর নেক বান্দাগণ রাতের বেলায় কম ঘুমিয়ে থাকেন, আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকেন, তাহাজ্জুদ আদায় করতে থাকেন, কিন্তু যখন ভোর বেলা হয় তখন তারা ইস্তেগফার করেন।"

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ভোর রাত তো ইস্তিগফার করার সময় নয়, কারণ ইস্তিগফার তো হয় কোনো গোনাহের পর। এরা তো সারারাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করেছেন। কোনো গোনাহ তো করেননি। তাহলে এরা ইস্তিগফার করতেন কেন? উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব লোক নিজের ইবাদতের ব্যাপারেই ইস্তিগফার করতেন। যেমন ইবাদত করা উচিত ছিলো তেমন ইবাদত করা আমার দ্বারা হয়নি। ইবাদতের যেই হক আদায় করা উচিত ছিলো, আমার দ্বারা সেই হক আদায় করা সম্ভব হয়নি।

মোটকথা, আল্লাহর এসব নেক বান্দাদের শুধু গোনাহের ভয় হয় না বরং ইবাদত ভুল হওয়ারও ভয় হয়ে থাকে যে, এই ইবাদত আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে যায়।

★★★মারেফাত অনুপাতে আল্লাহর ভয় হয়ে থাকে।

ভয়ের ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, আল্লাহ তা'আলার মারেফাত যতো বেশি হবে আল্লাহ তা'আলার ভয়ও ততো বেশি হবে। আর অজ্ঞতা যে পরিমাণ থাকবে, ভয়ও সেই পরিমাণ কম হবে। দেখুন! ছোট একটি বাচ্চা, যে এখনো নির্বোধ, তার সামনে যদি বাদশা আসে, উজির আসে বা বাঘ আসে, সে কোনো প্রকার ভয় করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাদশার মর্যাদা জানে, সে বাদশার সামনে যেতে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হযরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নবীগণের পর সবচে' বেশি ছিলো। এজন্য তাঁদের মধ্যে আল্লাহর তা'আলার ভয়ও বেশি ছিলো।

★★★হযরত হানযালা রাযি.-এর ভয়

হযরত হানযালা রাযি. একবার পেরেশান হয়ে দৌড়াতে থাকলেন। কাঁপতে কাঁপতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন,

! نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ

'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে মুনাফিক হলে? হযরত হানযালা রাযি. নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার মজলিসে বসা থাকি এবং জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা শুনি, আখেরাতের আলোচনা শুনি, তখন অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয়। আত্মা বিগলিত হয়। দুনিয়া বিমুখতা সৃষ্টি হয়। আখেরাতের ফিকির পয়দা হয়। কিন্তু যখন বাড়িতে যাই, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির সাথে মিলিত হই, জীবনের কাজ কর্মে লিপ্ত হই, তখন মনের সেই অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। বরং দুনিয়ার মহব্বত আমাদের আত্মার উপর আচ্ছন্ন করে নেয়। তাই এখানে এসে এক অবস্থা, আর বাইরে গিয়ে অন্য অবস্থা, এটা তো মুনাফিক হওয়ার আলামত। উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةٌ

অর্থাৎ, হে হানযালা! ভয় করার কিছু নেই। সময় ভেদে এমন হয়ে থাকে। আত্মা কখনো বেশি বিগলিত হয়, আর কখনো কম হয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে এর উপর ভিত্তি নয়। আসল ভিত্তি হলো আমলের উপর। মানুষের কোনো আমল যেন শরীয়ত বিরোধী না হয়।"**১**

১.সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৩৭

★★★হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর ভয়

হযরত ফারুকে আযম রাযি, নিজকানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শুনেছিলেন,

عُمر فِي الْجَنَّةِ

'ওমর জান্নাতে যাবে।"**১**

তিনি এ ঘটনাও শুনেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি যখন মেরাজে যান এবং সেখানে জান্নাত ভ্রমণ করেন তো জান্নাতের মধ্যে আমি একটা শানদার মহল দেখি। সেই মহলের পাশে এক মহিলা বসে ওযু করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই মহল কার? আমাকে বলা হলো, এটা ওমরের মহল। সেই মহল এতো শানদার ছিলো যে, আমার মন চাচ্ছিলো ভিতরে গিয়ে মহলটি দেখি। কিন্তু হে ওমর! তোমার আত্মমর্যাদবোধের কথা আমর স্মরণ হলো যে, তুমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। এজন্য আমি ঐ মহলে আর প্রবেশ করলাম না। ফিরে এলাম। হযরত ওমর ফারুক রাযি. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন, এবং নিবেদন করলেন,

وَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ !

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আত্মসম্মানবোধ দেখাবো!'২

দেখুন! হযরত ওমর ফারুক রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে নিজে জান্নাতের সুসংবাদ শুনেছেন। জান্নাতের মধ্যে নিজের মহলের বিবরণ শুনেছেন। এরপরও তাঁর অবস্থা এই ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর খেদমতে তাশরীফ নিয়ে যান। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে মুনাফিকদের তালিকা বলে দিয়েছিলেন যে, মদীনায় অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। হযরত ওমর ফারুক রাযি. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে হুযাইফা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন, এই তালিকার মধ্যে আমার নাম নেই তো?৩

তাঁর চিন্তা জেগে ছিলো যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন আবার না হয়ে থাকে যে. আমার পরবর্তী আমলের কারণে এসব সুসংবাদ হাতছাড়া হয়ে গেছে।

দেখুন! হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর এই আশঙ্কা লেগে আছে। যাইহোক, যে ব্যক্তির মারেফাত যতো বেশি হবে, তার ভয়ও ততো বেশি হবে। ন্যূনতম এই ভয় অন্তরে অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন হতে পারে না।

১.সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৬৮০
২.সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩
৩.আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্ড ৫,পৃষ্ঠা ১৯

★★★ভয় সৃষ্টি করার উপায়

এই ভয় সৃষ্টি করার পদ্ধতি এই যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থেকে ফজরের নামাযের পর অথবা রাতে ঘুমানোর পূর্বে কিছু সময় নির্ধারণ করবে। তখন এ কথা চিন্তা করবে যে, আমি মৃত্যু বরণ করছি, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত আছি। আপনজন আত্মীয়-স্বজন আমার চর্তুপাশে জমায়েত হয়ে আছে। আমার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কাফন পরানোর পর দাফন করা হচ্ছে।

ফেরেশতারা প্রশ্নোত্তর করার জন্য আসছে। আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাকে পেশ করা হয়েছে। এসব কথা মনযোগ দিয়ে চিন্তা করতে থাকবে। যখন মানুষ প্রতিদিন এসব কথা চিন্তা করবে, তখন ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে

আত্মা থেকে গাফলতের পর্দা সরে যেতে আরম্ভ করবে। আমরা মৃত্যুর ব্যাপারে গাফেল তাই আমাদের উপর গাফলত ছেয়ে আছে। নিজ হাতে নিজের প্রিয় লোকদেরকে মাটি দিয়ে আসছি। নিজের কাঁধে জানাযা বহন করছি। স্বচক্ষে দেখছি যে অমুক ব্যক্তি বসে বসে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। নিজ চোখে দেখি যে, যেই দুনিয়া সঞ্চয় ও অর্জন করতে সকাল সন্ধ্যা দৌড় ঝাপ করছিলো, পরিশ্রম করছিলো, কষ্ট করছিলো, কিন্তু যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলো, তখন তার দিকে মুখ ফিরিয়েও তাকালো না। এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, মৃত্যুর এ ঘটনা তার সাথেই ঘটেছে, আমাকেও যে একদিন এভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে, সে দিকে মনযোগ যায় না। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَهَا ذِهِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, সমস্ত স্বাদকে বিনাশকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো। মৃত্যুকে ভুলো না, বরং তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো। মোটকথা, প্রতিদিন সকাল বা সন্ধ্যায় সামান্য সময় এ বিষয়গুলো চিন্তা করবে, তাহলে এর মাধ্যমে কিছু না কিছু পরিমাণ কাঙ্খিত সেই ভয় অবশ্যই জন্ম নিবে।' ১

১.সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২২২৯

★★★আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ পদ্ধতি

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, যখন তিনি কোনো নতুন কাপড় পরতেন, তা পাগড়ি হোক, জামা হোক বা চাদর হোক, তখন ঐ কাপড়ের নাম রাখতেন এবং এই দু'আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهِ وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ

হে আল্লাহ আপনার শোকর যে, আপনি আমাকে এই পোষাক দান করেছেন। আমি আপনার কাছে এই পোষাকের কল্যাণ কামনা করছি এবং যেই কাজের জন্য একে বানানো হয়েছে তার মধ্যে উত্তম কাজ প্রার্থনা করছি এবং আমি এই পোষাকের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে সব খারাপ কাজের জন্য একে বানানো হয়েছে তার মন্দ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।"১

১.সূনানে তিরমিজি, হাদীস নং ১৬৮৯

★★★প্রত্যেক সময়ের দু'আ ভিন্ন

পোষাক পরার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করতেন। এটা তাঁর সুন্নাত। কারো যদি এই শব্দমালা মুখস্থ না থাকে তাহলে নিজ ভাষাতেই পোষাক পরিধানের সময় এসব কথা বলবে। উম্মতের উপরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিরাট ইহসান ও দয়া এই যে, তিনি পদে পদে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট দু'আর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা সীমাহীন মুখাপেক্ষী হলেও চাওয়ার পদ্ধতি জানি না। কি চাইতে হবে এবং কীভাবে চাইতে হবে তাও আমাদের জানা নেই?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পদ্ধতিও শিখিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে এভাবে চাও। সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য কাজ মানুষকে সম্পাদন করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক আমলের জন্য পৃথক দু'আ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে জাগবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যখন ইস্তেঞ্জার জন্য যাবে, তখন এই দু'আ পাঠ করবে। এস্তেঞ্জা শেষ হলে বাইরে এসে এই দু'আ পাঠ করবে। যখন ওযু শুরু করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। ওযুর মাঝে এই দু'আ পাঠ করতে থাকবে। ওযু শেষ করে এই দু'আ পাঠ করবে। যখন নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ

করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। অতঃপর মসজিদে ইবাদত করতে থাকবে। মসজিদ থেকে যখন বাইরে বের হবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যখন বাজারে যাবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যেন প্রত্যেক নড়া-চড়া, চলা-ফেরা, ওঠা-বসার বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে, এই সব দু'আ এভাবে পাঠ করবে।

★★★আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, নড়া-চড়ার সময় পৃথক পৃথক দু'আ কেন শিক্ষা দিলেন? এটা মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার এক অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার সহজতম এবং সংক্ষিপ্ততম পথ হলো, সব সময় মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকবে এবং দু'আ করতে থাকবে। কুরআনে কারীম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, অধিক পরিমাণে তাঁর যিকির করো।" ১

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সবচে' উত্তম আমল কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, সবচে' উত্তম আমল হলো,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

অর্থাৎ, তোমার জিহ্বা সবসময় যেন আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। সবসময় যেন আল্লাহর যিকির অব্যাহত থাকে। ২

সারকথা হলো, কুরআনে কারীমও অধিকহারে যিকির করার হুকুম দিয়েছে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীস শরীফে তার ফযীলতের বর্ণনা দিয়েছেন।

১.সূরা আহযাব, আয়াত ৪১
২.সূনানে তিরমিজি, হাদীস নং ৩২৯৭

★★★আল্লাহ তা'আলা যিকিরের মুখাপেক্ষী নন

এখন প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অধিক পরিমাণে যিকির করার হুকুম দিলেন কেন? আল্লাহ তা'আলার কি আমাদের যিকির দ্বারা কোনো লাভ হয়? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার কি এ কথায় মজা লাগে যে, আমার বান্দা আমার যিকির করছে? এর দ্বারা কি তাঁর স্বাদ লাভহয়? তার কোনো উপকার হয়? বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যার মারেফত আছে, তাঁর উপর যার ঈমান আছে, সে এ কথা কল্পনাও করতে পারে না। কারণ, সমস্ত জগত সবসময় প্রতি মুহর্তে যদি আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাকে তাহলে তাঁর বড়ত্ব, তাঁর প্রতিপত্তি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সামান্যতম বৃদ্ধি পাবে না। আর যদি নাউযুবিল্লাহ সারা জগত মিলে এ কথার অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে না, আল্লাহ তা'আলাকে বিস্মৃত হবে, যিকির থেকে গাফেল থাকবে, গোনাহর কাজে লিপ্ত থাকবে, নাফরমানীর মধ্যে লিপ্ত থাকবে তাহলেও আল্লাহর বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে সামান্যতম হ্রাস পাবে না। আল্লাহর মহান সত্ত্বা তো বেনিয়াজ, অমুখাপেক্ষী, আল্লাহুসসামাদ। তিনি আমাদের যিকির থেকেও অমুখাপেক্ষী, আমাদের সিজদা থেকেও অমুখাপেক্ষী, আমাদের তাসবীহ থেকেও অমুখাপেক্ষী, আমাদের যিকিরের-ও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

★★★আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফলত সমস্ত গোনাহের মূল।

তাহলে যে, অধিকহারে আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে বলা হচ্ছে? এর দ্বারা মূলত আমাদেরই লাভ। কারণ, দুনিয়াতে যতো অপরাধ, যতো অপকর্ম এবং যতো মন্দ কাজ সংঘটিত হচ্ছে, এর সবগুলোর মূল যদি দেখা হয় তা হবে আল্লাহ তা'আলার থেকে গাফলত। যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়, আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন গোনাহে লিপ্ত হয়। তবে যদি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরে থাকে, আল্লাহর যিকির অন্তরে থাকে এবং আল্লাহর সামনে জওয়াব দেওয়ার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত থাকে যে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তখন আর গোনাহ সংঘটিত হবে না।

চোর যখন চুরি করে তখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে। আল্লাহর স্মরণ যদি তার অন্তরে থাকতো তাহলে চুরি করতো না। ব্যভিচারকারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে। আল্লাহর স্মরণ থেকে যদি গাফেল না হতো তাহলে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারতো না। এ বিষয়টিই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন,

لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ যখন ব্যভিচারকারী ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। ১

সে সময় ঈমানদার না থাকার অর্থ হলো, সে সময় তার ঈমান উপস্থিত থাকে না। আল্লাহ তা'আলার স্মরণ এবং তাঁর যিকির উপস্থিত থাকে না। যখন চোর চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। অর্থাৎ ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ তার অন্তরে থাকে না। যদি ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরে থাকতো তাহলে সে গোনাহে লিপ্ত হতো না। এ জন্য সমস্ত মন্দ কাজ, সমস্ত অন্যায় অত্যাচার, সমস্ত দুর্নীতি যা দুনিয়াতে ঘটছে সব কিছুর ভিত্তি হলো আল্লাহর যিকির থেকে গাফলতি।

১.সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৭৪

★★★আল্লাহ কোথায় গেছেন!

হযরত ওমর ফারুক রাযি. একবার সফরে যাচ্ছিলেন। বনের মধ্যে সফর ছিলো। তখন বর্তমান যুগের মতো হোটেলের ব্যবস্থা ছিলো না। যখন ক্ষুধা লাগলো এবং পাথেয় শেষ হয়ে গেলো তখন তিনি জনপদ তালাশ করলেন। পাশে কোনো জনপদ থাকলে সেখানে গিয়ে খানা খাবেন। তালাশ করে দেখলেন ছাগলের একটি পাল বিচরণ করছে। তিনি নিকটে গিয়ে রাখালকে তালাশ করলেন। তার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি মুসাফির। আমার ক্ষুধা লেগেছে। বকরীর দুধ বের করে আমাকে দাও এবং আমার থেকে তার দাম নিয়ে নাও। যাতে আমি দুধ পান করে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারি। এটা ঐ যামানার কথা যখন হযরত ওমর রাযি, অর্ধেক পৃথিবীর অধিক এলাকার শাসক ছিলেন, বাদশাহ ছিলেন। উত্তরে রাখাল বললো, জনাব! আমি আপনাকে অবশ্যই দুধ দিতাম। কিন্তু ব্যাপার হলো, এ ছাগলগুলো আমার নয়। এগুলো আমার মালিকের ছাগল। তিনি আমাকে শুধু চরানোর জন্য দিয়েছেন। এজন্য এ ছাগলগুলো আমার নিকট আমানত। দুধও আমার নিকট আমানত। এজন্য মালিকের অনুমতি ছাড়া এর দুধ দেওয়ার অধিকার আমার নেই। আমি অক্ষম। হযরত ওমর রাযি.-এর অন্তরে চিন্তা জাগলো এ রাখালের একটু পরীক্ষা নেই। হযরত ওমর রাযি. রাখালকে বললেন, আমি তোমাকে একটি ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি। তুমি সেই অনুপাতে কাজ করলে তোমারও লাভ আমারও লাভ। রাখাল বললো সেটা কি? হযরত ওমর রাযি, বললেন, তুমি এক কাজ করো, একটা বকরী আমার কাছে বিক্রি করে তার মূল্য আমার থেকে নিয়ে নাও। এর দ্বারা আমার লাভ এই হবে যে,

বকরীটাকে আমি সাথে রাখবো এবং যখন প্রয়োজন হবে তার দুধ পান করবো। আর তোমার লাভ এই হবে যে, তুমি বকরীর দাম পেয়ে যাবে। আর মালিক যখন জিজ্ঞাসা করবে বকরী কি হয়েছে? তখন তুমি বলবে, বাঘে নিয়ে গেছে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা বনের মধ্যে ঘটেই থাকে। এজন্য সে বিশ্বাস করবে। এতে তোমারও কল্যাণ হবে, আমারও কল্যাণ হবে। রাখাল এ ব্যবস্থা শুনে সাথে সাথে বললো,

يَا هٰذَا فَأَيْنَ اللّٰهُ؟

'তাহলে আল্লাহ কোথায় গেছেন!"১

অর্থাৎ, এসব কাজ করলে আমার মালিক তো দেখবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো দেখবেন। এসব কিছু মূলত মিথ্যা এবং ধোঁকা। আল্লাহর সামনে কি উত্তর দেবো?

১.উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা,খন্ড-৩,পৃষ্ঠা ২২৮

★★★অপরাধ নির্মূল করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাধ তো নির্মূল করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুলিশ ছিলো না, অধিদপ্তর ছিলো না, আদালত ছিলো না, সেনাবাহিনী ছিলো না। কারো দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধী নিজে এসে কেঁদে কেঁদে বলতো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন, যাতে আখেরাতের শাস্তি থেকে বেঁচে যাই। আমাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলুন। ব্যাস, মূল কারণ এটাই ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ভয় অন্তরে বসে গেছিলো। এজন্য বলা হচ্ছে যে, অধিকহারে আল্লাহ তা'আলার যিকির করো। অন্যথায় আমাদের যিকির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার হয় না। যতো যিকির করবে ততোই আল্লাহ তা'আলার সামনে জওয়াব দেওয়ার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত হবে। অতঃপর গোনাহ, নাফরমানি ও অপরাধ থেকেও বেঁচে যাবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো।

★★★আল্লাহর সাথে সম্পর্কের হাকীকত

যাইহোক, আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর যিকির অন্তরে বসার নামই হলো তাআল্লুক মাআল্লাহ। অর্থাৎ, সব সময় আল্লাহ তা'আলার সথে কিছু না কিছু সম্পর্ক বজায় রাখা। সূফীয়ায়ে কেরামের সিলসিলায় যতো সাধনা, যতো মুজাহাদা, যতো ওযীফা ও যিকির আছে, সবকিছুর সারকথা এবং মূল উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক মজবুত হলে মানুষ থেকে আর গোনাহ সংঘটিত হয় না। বরং মানুষ তখন নিজের সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত উত্তম থেকে উত্তম পন্থায় সম্পাদিত করে। তখন মানুষের মধ্যে উত্তম গুণাবলী লাভ হয় এবং মন্দ চরিত্র থেকে মুক্তি লাভ করে। এ সব কিছু আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ হয়।

★★★সব সময় চাইতে থাকুন

আল্লাহ তা'আলার সাঙ্গে এই সম্পর্ক অর্জনের জন্য সূফীয়ায়ে কেরাম লম্বা চওড়া মুজাহাদা করতেন হতো, সাধনা করানো হতো। কিন্তু আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব বলতেন, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক লাভের জন্য আমি তোমাদেরকে অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ একটি পথ বলছি, তা হলো সবসময় আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকো এবং চাওয়ার অভ্যাস গড়ো। সবকিছু আল্লাহর কাছে চাও। যেই দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, পেরেশানী, প্রয়োজন, অভাব আছে, সব আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকো। গরম লাগলে বলো, হে আল্লাহ গরম দূর করে দিন। বিদ্যুৎ চলে গেলে বলো, হে আল্লাহ বিদ্যুৎ দান করুন। ক্ষুধা লাগলে বলো, হে আল্লাহ ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে দিন। ঘরে প্রবেশ করলে বলো, হে আল্লাহ ঘরে যেন ভালো দৃশ্য সামনে আসে। শান্তি এবং নিরাপত্তার খবর যেন পাই। কোনো পেরেশানীর কথা যেন না আসে। অফিসে প্রবেশ করার পূর্বে বলো, হে আল্লাহ অফিসে যাচ্ছি সব অবস্থা ঠিক করে দিন, মনের মতো করে দিন। সেখানে কোনো বিরূপ অবস্থা যেন সামনে না আসে। কোনো কষ্টকর পরিস্থিতি যেন সামনে না আসে। বাজারে যাচ্ছো তো বলো, হে আল্লাহ অমুক জিনিস ক্রয় করতে যাচ্ছি, উপযুক্ত মূল্যে তা দান করুন। সব সময় এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়ার অভ্যাস গড়ো।

★★★শয়তান ঈমান চোর

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে বলতেন যে, ওয়াসওয়াসা হলো শয়তানের কাজ। শয়তানই মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে। শয়তান হলো ঈমান চোর। সে আপনার ঈমানের উপর ডাকাতি করতে চায়। যে ঘরে সম্পদ

থকে, চোর এবং ডাকাত সেই ঘরে ডাকাতি করে। যদি সম্পদই না থাকে তাহলে ডাকাত ডাকাতি করবে না। তাই শয়তান যে আপনাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে এবং আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করছে তা এ কথার আলামত যে, আপনাদের অন্তরে ঈমানের দৌলত রয়েছে। যদি ঈমানের দৌলত না থাকতো তাহলে এই ডাকাত আপনাদের ঘরে প্রবেশ করতো না। এজন্য ওয়াসওয়াসার কারণে ঘাবড়াবেন না। আপনি যে বলছেন, আমার অন্তরে এমন সব ওয়াসওয়াসা আসে তা প্রকাশ করার তুলনায় জ্বলে মরে যাওয়া অধিক পছন্দনীয়। এ কথা আপনার ভিতর থেকে আপনার ঈমান বলছে। আপনার ঈমান বলছে যে, এ কথা মুখে প্রকাশ করা যাবে না। অন্তরে ঈমান না থাকলে এমন হতো না। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, এটা তো একান্ত ঈমানের আলামত।

ওয়াসওয়াসার কারণে পাকড়াও করা হবে না এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

'আল্লাহ তা'আলার শোকর যে তিনি শয়তানের ষড়যন্ত্র এবং জালকে ওয়াসওয়াসার সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হতে দেননি।"১

১.ইহয়াউ উলূমিদ্বীন, খন্ড-৩,পৃষ্ঠা -৩১৪

★★★আকীদা সম্পর্কে অনাহুত চিন্তা ওয়াসওয়াসা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক হয়ে থাকে আকীদা সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা। অর্থাৎ শয়তান আল্লাহ তা'আলার জাত ও আখেরাতের বিষয়ে অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, জানা নেই আখেরাত আসলেও আছে কি নাই। এ ধরনের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন যে, তুমি নিজের আকীদা ঠিক রাখলে এরপর এ সমস্ত অনাহূত চিন্তা বা ওয়াসওয়াসা যতই আসুক না কেন, এ জন্য ইনশাআল্লাহ পাকড়াও করা হবে না এবং এসব চিন্তার কারণে মানুষ কাফেরও হবে না। এ সব চিন্তার কারণে কতক মানুষ মনে করে যে আমি শয়তান হয়ে গেছি, আমি কাফের হয়ে গেছি। মনে রাখবেন এসব ওয়াসওয়াসা অন্তরে আসার দ্বারা কিছু হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ নিজের মন, নিজের জিহ্বা এবং নিজের আমলে মুমিন থাকে। এ জন্য এ ব্যাপারে মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

★★★গোনাহের চিন্তা

দ্বিতীয় হলো, গোনাহ করার এবং পাপ কাজ করার ওয়াসওয়াসা ও খেয়াল আসা। যেমন অন্তরে এই খেয়াল আসলো যে, অমুক গোনাহটি করি। কোনো গোনাহের দিকে মন ধাবিত হলো এবং তার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। যদি অন্তরে শুধু চিন্তা আসে তবে এজন্য ইনশাআল্লাহ পাকড়াও করা হবে না, যে পর্যন্ত চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা অনুপাতে কাজ না করবে। কিন্তু যদি গোনাহের চাহিদা অনুপাতে আমল করে তাহলে এটা পাকড়াও যোগ্য হয়ে যাবে। এ জন্য পাকড়াও করা হবে। তাই যখনই কোনো গোনাহের খেয়াল বা ওয়াসওয়াসা আসবে যে অমুক গোনাহটি করি, অবিলম্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাইবে যে, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে এই গোনাহের চিন্তা আসছে, আমি আপনার কাছে এ থেকে পানাহ চাচ্ছি। আপনি আমাকে এই গোনাহ থেকে রক্ষা করুন। এভাবে এই অনাহূত চিন্তা ও ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করবে।

★★★মন্দ চিন্তার সময় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে যে, তিনি যখন পরীক্ষায় আক্রান্ত হন এবং সেই পরীক্ষার ফলে অন্তরে গোনাহের কিছু ওয়াসওয়াসা আসে- কারণ তিনি তো মানুষই ছিলেন- তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই দু'আ করেন,

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

'যদি আপনি আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত না করেন তাহলে আমার আত্মাও তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে, আর যারা অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হয়ে যাবো।" ১

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি ঐসব মহিলার চক্রান্তকে আমার থেকে দূর করে না দেন তাহলে আমিও তো একজন মানুষ আমি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবো। ফলে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হবো। এ জন্য ঐসব মহিলাদের চক্রান্তকে আমার থেকে দূর করে দিন। যখনই কোনো গোনাহের চিন্তা বা ওয়াসওয়াসার চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হবে সাথে সাথে আল্লাহ দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর নিকট আশ্রয় চাইবে যে, হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে এই গোনাহ থেকে হেফাজত করুন। এবং তখন নিজের হিম্মতকে জীবন্ত করবে যে, আমি গোনাহের

এই চাহিদার উপর আমল করবো না। যদি এ কাজ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এসব অনাহুত চিন্তা এবং ওয়াসওয়াসার কারণে কোনো ক্ষতি হবে না।

১.সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৩

★★★নামাযের মধ্যে উদিত বিভিন্ন চিন্তার বিধান

ওয়াসওয়াসার তৃতীয় প্রকার যদিও মুবাহ বা বৈধ। কারণ তা কোনো গোনাহের চিন্তা নয়। কিন্তু সে চিন্তা মানুষকে ইবাদত এবং আনুগত্যের দিকে মনোযোগী হওয়া থেকে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, নামাযের নিয়ত বাঁধার সাথে সাথে সারা দুনিয়ার চিন্তা চক্রের মতো ঘুরতে আরম্ভ করে। সে সব গোনাহের চিন্তা না হলেও- যেমন খানা-পিনার চিন্তা, বিবি-বাচ্চার চিন্তা, নিজের রুজির চিন্তা, ব্যবসার চিন্তা এ সমস্ত চিন্তা মৌলিকভাবে গোনাহের নয়- কিন্তু এ সব চিন্তার করণে মন নামাযের দিকে ধাবিত হতে পারে না। এ সব চিন্তার কারণে খুশুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তাই এসব চিন্তা যেগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে এবং তার মধ্যে মানুষের ইচ্ছার কোনো দখল থাকে না, ইনশাআল্লাহ সেগুলোর কারণে পাকড়াও করা হবে না, বরং তা মাফ। তবে নিজে ইচ্ছা করে নামাযের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা জাগ্রত করবে না এবং সে দিকে মনযোগ দিবে না। বরং 'আল্লাহু আকবার' বলে যখন নামায শুরু করবে তখন মনকে নামাযের দিকে আকৃষ্ট করবে, মনযোগী করবে। যখন ছানা পড়বে তার দিকে ধ্যান দিবে এবং যখন সূরায়ে ফাতেহা পড়তে আরম্ভকরবে তখন তার দিকে মনযোগ দিবে। এরপর মনযোগ দেওয়া সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে মন অন্যদিকে যদি সরে যায় এবং বিভিন্ন অনাহূত চিন্তা জাগতে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ এজন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যেই মাত্র সর্তক হবে যে, আমি তো অন্য মনস্ক হয়ে গেছি, তখন পুনরায় নামাযের দিকে মনকে ফিরিয়ে আনবে। নামাযের শব্দ এবং যিকিরের দিকে ফিরিয়ে আনবে। বারবার এইভাবে করতে থাকবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ এ সব চিন্ত ার আগমন হ্রাস পেতে থাকবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খুশু দান করবেন।

★★★নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না

যাইহোক, নামাযের মধ্যে যে সব চিন্তা আসে সেগুলোর কারণে অনেক মানুষ খুব বেশি পেরেশন হয় এবং মনে করে যে, আমার নামায তো ওঠা-বসা মাত্র। এর মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। মনে রাখবেন! নামাযের এমন অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। আরে এটা তো আল্লাহ তা'আলার দয়া যে, তিনি আপনাকে নামায পড়ার তাওফীক দান করেছেন। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করুন এবং এ সব চিন্তার কারণে নিজের নামাযকে বেকার মনে করবেন না। নামাযের তাওফীক পাওয়া তো আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। এ সব অনিচ্ছাকৃত চিন্তার কারণে ইনশাআল্লাহ আপনাকে পাকড়াও করা হবে না। তবে সেচ্ছায় নামাযের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা আনবে না।

★★★নেক কাজ এবং গোনাহের ইচ্ছার উপর পুরস্কার

যাইহোক, এ হাদীসের সার কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আত্মার চিন্তার উপর পাকড়াও করা হবে না। কারণ, আল্লাহর রহমত বিস্ময়কর। তিনি গোনাহের বিষয়ে এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যদি অন্তরে গোনাহ করার আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং মনে মনে ইচ্ছাও করে যে, আমি এই গোনাহ করবো, তবে সে ইচ্ছা সংকল্প ও পোক্ত না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। বরং যদি বারবার গোনাহের খেয়াল আসতে থাকে আর মানুষ সেই খেয়ালকে প্রতিহত করতে থাকে এবং সে অনুপাতে আমল না করে তাহলে ইনশাআল্লাহ গোনাহ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে ছওয়াব ও পুরস্কার লাভহবে। কারণ, গোনাহের চিন্তা জাগা সত্ত্বেও সে গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এবং নেকীর বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার মূলনীতি এই যে, যদি কোনো নেক কাজের চিন্তা অন্তরে জাগে এবং তা করতে ইচ্ছা করে যে, আমি অমুক নেক কাজটি করবো, যদিও নেক কাজটি করার জন্য পোক্ত ইরাদা করেনি, তবুও শুধু ইচ্ছা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছওয়াব দান করবেন। যেমন ইচ্ছা করলো যে, আমার যদি মাল হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় এ পরিমাণ মাল দান করবো। তো এর জন্যও তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে। বা ইচ্ছা করলো যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সুযোগ হলে জিহাদ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবো। তো এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও শহীদদের মধ্যে গণ্য করবেন। হাদীস শরীফে এসেছে,

مَنْ سَئَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

'কোনো ব্যক্তি যদি আত্মা থেকে শাহাদাত কামনা করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মধ্যেই গণ্য করবেন, যদিও বিছানাতে তার মৃত্যু হয়।"১

যাইহোক, নেক কাজের ব্যাপারে নিয়ম হলো, পোক্ত ইরাদা করার পূর্বেও আল্লাহ তা'আলা নেকী দান করেন এবং গোনাহের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, পোক্ত ইরাদা না করা পর্যন্ত পাকড়াও করা হবে না। এটা আল্লাহ তা'আলার রহমতের ব্যাপার।

১.সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫৩২

★★★কার নামাযের মধ্যে রূহানিয়াত বেশি?

এরপর হযরত বলেন, বলো! এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কার নামাযে রূহানিয়াত অধিকতর? বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় যে, প্রথম ব্যক্তির নামাযের মধ্যে রূহানিয়াত অধিক। কারণ সে আযানের সময় ঘর থেকে বের হয়েছে। মসজিদে এসে এতমিনানের সাথে ওযু করেছে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়েছে। সুন্নাত নামায পড়েছে। এতমিনান ও খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নামায রূহানিয়াতের অধিক নিকটে। যদিও সে উর্ধ্বশ্বাসে এসে নামায আদায় করেছে। কারণ প্রথম ব্যক্তির উপর কোনো দায়-দায়িত্ব ছিলো না এবং তার কোনো চিন্তা ও পেরেশানী নেই। সে নিজেকে সমস্ত জিম্মাদারী থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। এর ফলে তার নামাযের মধ্যে বড়ো স্বাদ লাগছে, উপভোগ হচ্ছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ঠেলাগাড়ি ঠেলে আসছে। সেই ঠেলার উপরে তার জীবিকা এবং পরিবারের লোকজনের জীবিকা নির্ভরশীল। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজিরার সময় হয়েছে তখন সেই ঠেলাগাড়ি আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়া থেকে তাকে গাফেল করতে পারেনি। সে ঠেলাগাড়িটি রেখে জামাতের শেষ কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নামায আদায় করেছে। তার নামায অধিক কষ্টকর। তার নামায অধিক কবুলিয়াত ও ছওয়াবের কারণ হবে। যদিও তার কোনো ভাবের সৃষ্টি হয়নি এবং তার কোনো স্বাদ লাগেনি। কিন্তু এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তার ছওয়াব কম করবেন না, ইনশাআল্লাহ।

★★★নিরাশ হবেন না

আজকাল মানুষ সাধারণত অনিচ্ছাকৃত বিষয়ের পিছনে লেগে থাকে। এর কারণে পেরেশান হয় এবং নিরাশ হয়। নিরাশার ফলে অবশেষে শয়তান তার থেকে সেই আমল ছুটিয়ে দেয়। শয়তান তাকে শেখায় যে, তোমার নামায যখন কোনো উপযুক্ত না তো এই নামায পড়ে লাভ কি? শয়তান এই গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত করিয়ে দেয়। এজন্য অনিচ্ছাকৃত জিনিসের পিছনে পড়া উচিত নয়। নামায পড়ার যেই পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন সেই পদ্ধতি মতো নামায পড়ার ফিকির করুন। নিজের পক্ষ থেকে মনযোগ দেয়ার চেষ্টা করুন। এর পরে ভাবের উদয় হোক বা না হোক, নামাযের মধ্যে স্বাদ লাগুক চাই না লাগুক, এতে কোনো তারতম্য হবে না। আল্লাহ তা'আলার এখানে সে নামায কবুল হবে।

★★★সারকথা

সারকথা এই যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে আমাদের আখলাককে পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আখলাক দ্বারা অভ্যন্তরীণ আমল উদ্দেশ্য। আখলাককে পরিশুদ্ধ করার উত্তম ও সহজ পন্থা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা। এজন্য আল্লাহ ওয়ালাদেরকে তালাশ করুন। তাদের সোহবত অবলম্বন করুন। তাদের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।